বাঙলার গল্প-সংগ্রহ

মিহির আচার্য সম্পাদিত

শুকসারী প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল
দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৫৮

মিহির আচার্য
শুকসারী প্রকাশক
১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা-১৪

মুদ্রাকর :
প্রণতি ঘোষ
জুবিলী প্রিণ্টার্স
১২৪ অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা-৯

কলকাতা, কলকাতা

মিহির আচার্য

ক্লান্ত সন্ধ্যায় সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে আবার মনে হল সীতার: একটা দিন অপেক্ষায়-অপেক্ষায় খরচ হয়ে গেল! না, বাড়িতেও কোনো খবর রেখে যায়নি। আশ্চর্য, কোথায় গেল, কী হল ওর? ওর কথামতো শ্যামবাজার কফিহাউসের সামনে ঠিক ছটা থেকে দাঁড়িয়েছিল ও। বাড়িতে মার কিছু ফরমায়েশ ছিল, টুকিটাকি মার্কেটিং, একবার গড়পারে পিসিমনির বাড়িতে খোঁজ নিয়ে আসা! মার কোনো আদেশই পালন করতে পারা যায়নি। কারণ প্রায় হপ্তা দুয়েক পরে নিখিলেশের হঠাৎ এই জরুরি তলব। কী বিশেষ প্রয়োজন আছে। আহ্, প্রয়োজন। এখন স্বাভাবিক কারণে রাগ হল সীতার। যেন ও নিখিলেশের প্রয়োজনের চাকরি করে। এবং ওর কথামতো নাকে-দড়ি-বেঁধা সুশীল জন্তুর মতো ওকে ধাবিত হতে হবে। সীতা অকারণ জীবনকে জটিল করতে চায় না, ধার-করা উত্তেজনার গুহায় বাস করতে চায় না বলেই নিখিলের আহ্বানে সাড়া দিতে তৈরি ছিল। বস্তুত সেই কারণেই সে গিয়েছিল। নতুন কোনো কৌতূহল কিংবা আকাংক্ষা পোষণ করেনি। নিখিলেশের দৌড় জানতে তার বাকি নেই। আসলে ও নাটক করতে ভালোবাসে। যেন ও ইচ্ছে করলে বাড়িতে আসতে পারত না! বাড়িতে ও কতবার এসেছে, মাকে মাসিমা মাসিমা বলে কত আদিখ্যেতা। হঠাৎ ডুব মেরে আবার ভেসে উঠে ওর প্রয়োজনগুলো যে কী চেহারা নিলো কে জানে। বেশ তো, এলো না কেন। সীতা তো একটা ছেলে-খেলা ভেবেই গিয়েছিল, একটা সন্ধ্যার মূঢ় অপব্যয় জেনেও। নিখিলেশবাবুর দেখা নেই।

প্রায় পৌনে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে সীতা। ওর ভদ্রতায় কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। আর, সীতাকে একটা বাজে ম্যাটিনি শো দেখে ফিরে-আসা ভোঁতা ক্লান্ত মনোভাব নিয়ে চলে আসতে হল। আচ্ছা সীতা কেবল নিজের দিকটাই ভাবছে। ধরো নিখিলেশের যদি কিছু হয়েই

থাকে, আকস্মিক কোনো বিপদ, দুর্ঘটনা! এমন কী হওয়া সম্ভব নয়? সীতা যেন রাগে অন্ধ হয়ে যুক্তিটা অবিশ্বাস করল। ইচ্ছে করলেই এ জাতীয় আকস্মিক বিপদ হাজারটা বানানো যায়। এবং তাতে নাটকীয়তা অত্যধিক ঘন হয়ে ওঠে। সকালে একটা দেখা-করার নির্ঘণ্ট রচিত করে সেদিন সন্ধ্যার মধ্যেই তা বাতিল হওয়ার কারণগুলি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নয়।

নিখিলেশ ইচ্ছা করেই আসেনি। কিংবা, কিংবা ও ধারেকাছে গা ঢাকা দিয়ে তার বিপন্ন অবস্থা দেখে কৌতুক করেছে। কে জানে ও হয়তো ভেবে রেখেছিল সীতা আসবে না। সীতা ভ্রূ কুঁচকালো; আহ্, কেন ওর এমন ভাবনা হল। সীতা কী আজো ওর কাছে কিছু আশা করে! মরণ আর কী। নিখিলেশবাবু তুমি তাহলে মেয়েদের চেনো না। কিছু আশা করলে সীতা নিশ্চয় এমনভাবে দেখা করতে আসত না। পোস্ট গ্রাজুয়েটের দিনগুলি আর নেই। সীতা উনিশ বছরটাকে ত্যাগ করে এসেছে। সীতার না-যাওয়ার অর্থ হত ও এখনো নিখিলেশকে মনে রেখেছে। নিখিলেশ আত্মম্ভরিতার স্বপ্ন দেখে সুখী হতে পারত। এইতো সীতা অসংকোচে হাজির হল। নিখিলেশ সম্মুখীন হতে পারল না কেন। তার কারণ; সীতা ঠোঁট কুঞ্চিত করল, দুর্বল দুর্বল একেবারে। হোপলেস। সত্যি সত্যি সীতার উপস্থিতি নিখিলেশকে কাপুরুষ করে দিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছিল একঘেয়ে খেলা আর চলবে না। হ্যাঁ নিশ্চয় ওর সঙ্গে চা বা কফি খেতে সীতা তিলমাত্র আপত্তি করত না, পার্কের নির্জন পথে হাঁটতেও। কিন্তু, তারপর? কফির পেয়ালা শেষ হত, হাঁটায় ক্লান্তি আসত। তারপর ওই নির্জনতার দেয়ালগুলো বরফের মতো শীতল হয়ে আসত, তখন··· ? ওর প্রয়োজনের ব্যাপারটাকে কী স্মরণ করে দিত সীতা? বড ভুলো মন নিখিলেশবাবুর। নিখিলেশ অত ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছে কেন। ওর চোখ জোড়া আঁতি পাঁতি কী খুঁজছে। আহ, নিখিলেশবাবু তোমাকে দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। হাসতে গিয়ে সীতার চোখ ছলছল করে উঠল। চোখ দেখাতে হবে। পাওয়ার বাড়ল কিনা কে জানে। নিখিলেশ, জানি, হেঁটে হেঁটে রাত কাবার করে দিলেও তোমার কথাগুলো আর সরব হবে না। কারণ কথা তো আর মুখস্ত শব্দপিণ্ড নয়, যে রোজ রোজ একইভাব প্রয়োগ করে যাবে! কথাগুলোর অর্থ আছে, ব্যঞ্জনা আছে। তা না হলে তো সঙ্গে টেপ-রেকর্ডার নিয়ে বেরোলেই পারতে।

এখন নাকি তোমার মুখস্ত কথাগুলোকে রোমন্থন করতে অনীহা হচ্ছে! নাকি সীতাকে ভয় করছে নিখিলেশ! কেন? ডাকামাত্রই যে মেয়ে হুজুরে হাজির তাকে আর ভয় কী। তুমি ইচ্ছে করলে বিনা বাধায় সীতাকে ট্যাকসি করে তোমার সেই উদার বন্ধুর ব্যাচেলারস ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে পারো। যেমন নিয়ে গিয়েছিলে একদিন? তখন বয়েসটা উনিশ ছিল তাই না?

কী বলছ, ওসব কথা কেন? না, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই বলছি। মানে, তুমি যে-যে কাজগুলো পারো আর কী। নিখিলেশ তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে সেদিন তোমার অনেক কাজেরই আমি নিঃশব্দ সঙ্গী ছিলাম। তুমি নিশ্চয় আমার সাহসের প্রশ্ন তুলবে না। দ্যাখো আজো আমি তোমাকে অফার দিচ্ছি তোমার সুবিধেমতো যে কোনো নিরিবিলি অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে নিয়ে যেতে পারো, আমি বাধা দেবো না। হি হি হি। দেখলে তো আজ তোমার নিজের শক্তির পরেই বিশ্বাস নেই। তুমি জানো সীতার বয়স আজ পঁচিশ। পঁচিশ বছর বয়েসের মেয়েকে নরম শয্যায় দীর্ঘকাল আটকে রাখা যায় না। যায় কি? তুমিই বলো নিখিলেশবাবু? তাহলে আর তুমি সীতাকে নিয়ে কী করবে? উনিশ বছরের শরীরের লোভকে নিয়ে তো আর পঁচিশ বছরে ছ্যাবলামি করা যায় না! স্বভাবতই তুমিই অমন পরিবেশে আমাকে নিয়ে যেতে ভয় পাবে। তোমার বাকচাতুরি এবং শারীরিকতা—দুটো বিষয়ই আমার কাছে বস্তাপচা। ইতিমধ্যে ডি-ভি-সির বাড়তি জল-ছাড়ার ফলে বছর-বছরই দামোদরে বন্যা হয়ে চলেছে। আমরা এমন একটা বাঙলাদেশে বাস করছি যেটা দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ংকর। এই দুঃসময়ে তোমার কথাশিল্প এবং সমূহ দৈহিক বিজ্ঞাপন অবান্তর হাস্যকর। আমরা আগুনের বেড়ার মধ্যে বাস করছি, প্রতিদিন এই বেড়ার মধ্যে থেকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। কোনো দিন কলেজে যেতে পারছি, কোনোদিন মাঝপথে ফিরে আসতে হচ্ছে। বন্‌ধ, হত্যা, ঘেরাওয়ের সঙ্গে তাল রেখে কলেজে পড়াচ্ছি। জানিনে এই সকল প্রশ্ন তোমাকে বিদ্ধ করে কিনা! তাই হঠাৎ তোমার এই খাপছাড়া আমন্ত্রণে অবাক হয়েও গরহাজির হতে পারিনি। কিন্তু নিখিলেশবাবু এল না।

ঘরে পা দিতেই মা বলল: 'কী রে? এত শিগ্রি ফিরলি?'

সীতা মেজাজ করে বলল : 'কৈফিয়ত দিতে হবে ?'

'শোনো মেয়ের কথা ! বললি নে ফিরতে দেরি হবে ।'

সীতা গম্ভীর হয়ে বলল : 'অ বলেছিলাম বুঝি ?'

'আহা ।'

'মা একটু চা করবে ? ভীষণ মাথা ধরেছে ।'

সীতা শয্যায় কাত হয়ে পড়ল ।

চোখের সামনে শাদা দেয়াল আর যামিনী রায়ের সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপটি টাটা কম্পানির দৌলতে ক্যালেণ্ডার হয়ে ঝুলছে। নিখিলেশ তাহলে কথা রাখল না। ভীষণ অন্যায়। এমনভাবে সীতাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি না-ফিরলে ভালো হত। বাড়িতে পা দিয়ে মনে হল বাড়িতে এখন ওর কোনো কাজ নেই। মা এখন পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকবে। আজকাল মা এমন ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত খুব কম পায়। মা ভাবে সীতা এখনো ছোটো আছে। মা একটা বিরক্তিকর অস্তিত্ব, উচ্চারণ করেই হাসল সীতা। নিখিলেশের কী হল! দিনকাল যেমন। বাড়িতে সাত-তাড়াতাড়ি না-ফিরে স্তুতপার ওখানে জমিয়ে আড্ডা দেয়া যেত। কলেজে কোলিগদের মধ্যে স্তুতপার সঙ্গে যা তু একটা কথা বলা যায়। বাঙলাদেশের উদ্‌বাস্তুদের সাহায্যে একদিনের মাইনে দেয়ার ব্যাপারে কী অসভ্য হইচই করে উঠল বিদুষী অধ্যাপকরা। অথচ দৈবাৎ কলেজে দুঃস্থ মেয়েরা ভ্যানিটি ব্যাগ বেচতে এলে শাড়ির রঙ মিলিয়ে ব্যাগ কেনবার ধুম পড়ে যায়। তখন টাকা বেরোয়! স্তুতপাই সেদিন তার পক্ষ নিয়ে টিচারসরুমে ঝগড়া করেছিল। উচিৎবক্তা মেয়েটা। আমরা ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছি। কলেজের সঙ্গীরা অসহ্য। নাভিমূলের বাইরে চোখ মেলে জগৎটাকে দেখতে ভুলে যাচ্ছি। কেবল মাইনে বাড়াও, ডি-এ বাড়াও। চারদিকের অমানুষিক এই অভাব, দুঃখযন্ত্রণা। উদ্‌বাস্তু··· । যামিনী রায় এত সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকেন কালিঘাটের পটে ঝুঁকলেন কেন! নিখিলেশ মনে করলে বাড়িতেও আসতে পারে। তাড়াতাড়ি বাড়িফেরার যেন জরুরি কারণ খুঁজে পেল সীতা। আচ্ছা? সীতা নিজের মনে হাসল : দেরি করেও যদি নিখিলেশ শ্যামবাজারে পৌঁছয় তাকে দেখতে না-পেয়ে পরবর্তী কাজ হবে ওর সীতার বাড়িতে আসা। স্তুতপার বাড়িতে আড্ডা দিলে নিখিলেশ যোগাযোগের সূত্র হারাত। বিছানায় শরীরটাকে

নিভার ছড়িয়ে দিল সীতা। মা একটা জ্বালা, আবার হাসল সীতা।

'মা—'

'হ্যাঁ এই যে। শুধু চা খাবি?'

সীতা মার দিকে তাকাল।

'কী দেখছিস অমনি করে?' মা হাসল।

'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি'···মার গলা জড়িয়ে আদুরেপনা করল সীতা।

'তোদের আজকাল স্বদেশী গানের ফ্যাশান হয়েছে···' মা হাসল।

'আজি বাঙলাদেশের হৃদয় হতে···'

'আ, ছাড় ছাড়।' মা বলল: 'আজ তোর সঙ্গে একটা দরকারি কথা···'

'জানি। ছোটোমামার সেই বন্ধু? কোথায় মুনসেফের পোস্টিং পেয়েছে?'

'ছেলেটি ভালো। শিক্ষায়-দীক্ষায় বংশ গৌরবে···'

'মা এ সমাজে যে যত শিক্ষিত সে তত মূর্খ···'

'বাজে কথা রাখ। কেন? তোর সুবিমলকে পছন্দ নয়?'

'আ, মা।

'তোকে কথা দিতেই হবে।'

'কথা। মা তুমি শেকসপীয়র পড়েছ?'

'না। তুই কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়েছিস?'

'মাই পুওর মাদার···'

'আমি ইংরিজি বুঝিনে বলে ইয়ারকি করিসনে।'

'মা তোমার কোনো উচ্চাকাংক্ষা নেই।'

'জ্বালাসনে। মেয়েদের ভালো বিয়ে হওয়া ছাড়া আর কী আকাংক্ষা থাছে? নাকি তুই বিবেকানন্দ হবি ঠিক করেছিস? এইসব দেখবার জন্যে কী আমি বেঁচে আছি।'

'মা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম করো তো?'

'কেন? ইন্দিরা গান্ধী।'

'তবে?'

মা বলল: 'তুই ইন্দিরা গান্ধী হবি?'

'বিয়ে করা ছাড়াও মেয়েদের উচ্চাকাংক্ষা থাকে।'

'তোর সঙ্গে কথায় পারব না বাপু। তাহলে ওদের কী জানাব বল? এমন ছেলে কী পড়ে থাকবে?'

'মা আজ কাগজে নটা খুন।'

মা চুপ।

'আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে / কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে। মা—' নিখিলেশের কী এখনো আসার সময় হল না। তাহলে আর বাড়ি-ফেরার কী মানে হল। 'মা রাগ কোরো না। এখন এ জাতীয় বিষয় নিয়ে তোমার আমার মধ্যে রাগ করার কোনো অর্থ নেই। তুমি নিশ্চয় জানো আমি মুনসেফের বউ হলে তোমার কিছু দশটা হাত গজাবে না।'

মা রাগ করে চায়ের বাটি নিয়ে উঠে গেল।

বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে ফেললেই হয়। সাড়ে আটটা। এই রাতে আর যেই আসুক নিখিলেশ আসবে না। উত্তর কলকাতার হাবভাব ওর কোনো কালেই তেমন বরদাস্ত হয় না। ও তো আবার দক্ষিণ শহরতলির ছেলে। তার মানে লেক, গড়িয়াহাট, দখিন বাতাস। তবু যদি সীতা না জানত। আজ উত্তর-দক্ষিণ-মধ্য কোথায় তুমি যাবে? তরুণ বয়েসের প্রেমের উদার ময়দান পর্যন্ত জ্বলে খাক হয়ে গেছে। সেদিন গলাকাটা বয়স্ক অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের লাশ পাওয়া গেছে ময়দানে।

আরে, কে কড়া নাড়ছে না? সীতার চিন্তার আলস্যগুলো যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। দোতলার বারান্দা থেকে উঁকি মেরে মানুষটাকে দেখেই আপাদমস্তক বিরক্তিতে ভরে উঠল সীতার।

মা দরজা খুলে দিয়েছে।

'সীতামা আছে?'

'পণ্ডিতমশায় আসুন।'

একদা ইস্কুলে পড়িয়েছেন বলেই কী জনার্দনবাবুর ছাত্রীর ওপর অহেতুক জুলুম করবার অধিকার জন্মে গেছে। কালকেই বলে দিয়েছে মৃদুলার চাকরি হবে না। ইণ্টারভিউয়ে এক্সপার্টদের ওর ওপর খুব খারাপ ধারণা হয়েছে সাম্প্রতিক বাংলা ছোটো গল্পের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ও একটা জবাবও দিতে পারেনি। অথচ ও বাঙলার অধ্যাপনা করবে! পণ্ডিতমশায়ের অভিমত কলেজে পড়াতে সাম্প্রতিক সাহিত্যের হালচাল না জানলেও চলে। বেশ তো। গভর্নিং বডির কাছে যান তাহলে। টিচারস কাউন্সিল কী করতে পারে এ ব্যাপারে।

সীতা নত হয়ে পণ্ডিতমশায়ের পায়ের ধুলো নিল।

'আপনি আবার এলেন কেন। বলেছি তো কোনো ডেভেলপমেণ্ট হলে আপনাকে জানিয়ে আসব।'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম...'

'চা খাবেন -'

'না এই সময়ে আর...'

'আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? মৃদুলা তো একটা ইস্কুলে আছে।'

'না, কী জানো, তুমি আমার নিজের মেয়ের মতো, তাই বলছি। ওর কলেজের কাজটা হলে ওর জন্যে একটা ভালো সম্বন্ধ অপেক্ষা করে আছে। ছেলেটি অ্যাকাউনটেণ্ট জেনারেল আপিসের ইউ-ডি। সম্বন্ধের সময় মৃদুলার কলেজের চাকরি হওয়ার সম্ভাবনার কথাটাও বলা হয়েছিল ওদের। জানো তো আজকালকার ছেলেদের চাকরি-করা মেয়েদের পছন্দ।'

কঠিন একটি মন্তব্য করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সীতা। হেসে বলল: 'ইণ্টারভিউ তো আরো কয়েকজন দিয়েছে পণ্ডিতমশায়। একজন আবার আমাদের কলেজেরই ছাত্রী।'

'হ্যাঁ সেইজন্যেই তো আমার বারবার আসা। শুনেছি প্রিন্সিপাল তোমাকে খুব স্নেহ করেন। ধরাকরা না হলে কী আজকাল চাকরি হয়।'

'বলেছি তো আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।' নিখিলেশ আর এল না!

'তাহলে আজ আসি।'

'আচ্ছা।'

সীতা নিঃশব্দে খোলা ছাদে উঠে এল।

আজকাল রাস্তার বাতিগুলোরও যেন জোর কমে গেছে। আকাশের ছিটনো তারাগুলোও শহরকে আলোকিত করতে পারে না। এ শহর তার পঁচিশ বছরের অস্তিত্বে কেমন ভেঙেচুরে বনেদী বাড়ির অব্যবহৃত ঝাড়লণ্ঠনের মতো পড়ে রয়েছে। আজো কী বাইরে থেকে লোক কলকাতা দেখতে আসে! আচ্ছা, সত্যি কোন অংশকে কলকাতা বলে? জোড়াসাঁকো, বড়বাজার, ডালহৌসি, চৌরঙ্গি, কালিঘাট, বালিগঞ্জ, কাশীপুর, বরাহনগর? আহা কোন্‌টা কলকাতা? ধেৎ।

'এই সীতাদি—'

কে ?

'আমি—'

'রমা না ? কবে এলে শ্বশুরবাড়ি থেকে ?'

'পরশু।'

'কেমন ভালো তো ? কদ্দিন মেয়াদ ? কর্তাকে বেঁধে এনেছ।'

'কোয়ার্টার খালি করে কী আসার উপায় আছে ? এক বেলা না-থাকলেই সব চুরি হয়ে যায়।'

'তাহলে তো মুশকিল। ওদিকে মানুষটি হয়তো হাত পুড়িয়ে রান্না করছে, অ্যাঁ ?'

'হ্যাঁ। কালকেই চলে যেতে হচ্ছে।'

'তারপর ? নতুন খবরটবর কিছু আছে ?'

'না। নষ্ট হয়ে গেছে।'

'আহা।'

'তোমাকে অনেক দিন পর দেখছি। তুমি আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছ।'

'যা।'

'পরের বার এলে তোমাদের বাড়িতে যাব। মাসিমা ভালো আছেন ?'

'ভালো-থাকা কী সহজ কথা ? চলে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ চলে যায়। আজ আসি। মা ডাকছে।'

সীতা ঘাড় নাড়াল।

রমার স্মৃতিটা এখন মিষ্টি লাগছে। এই সেদিন পর্যন্ত কী দস্যি মেয়ে ছিল। বছর তিনেক বিয়ে হয়েছে। ওর বিয়েতে বোধহয় ওমরখৈয়াম উপহার দিয়েছিল সীতা। মা দিয়েছিলেন শাড়ি। ছাদে হাওয়া দিয়েছে। সিঁড়ির এখানে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। চুপচাপ বসেছিল নিখিলেশ। ও যেন বহুক্ষণ থেকে উশখুশ করছিল। ঘরের আলোতে ওর মুখ থমথমে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। প্রশ্ন করে উত্তর পায়নি সীতা। তারপর নিঃশব্দে ছাদে উঠে এসেছিল নিখিলেশ। পরে সীতাও এসেছিল। ছাদের কার্নিশে সীতা হেলান দিয়ে ছুটন্ত গাড়ি লক্ষ্য করছিল। তারপর ধপ করে এসে বসেছিল নিখিলেশের পাশে। নিখিলেশ কী অসুস্থ ছিল সেদিন ? আকাশে মেঘগুলো দ্রুত অপসৃত হচ্ছিল। হাওয়া কাঁপছিল। এবং তারপর

সীতা এক পলকে দেখল সারা নক্ষত্র-ছিটনো আকাশটা তার মুখের ওপরে ভেঙে পড়েছে, আর চাঁদটা তরুণ পুরুষ মুখাকৃতি হয়ে তার বিস্ফারিত ঠোঁটে প্রণয়সম্ভাষণ ঢেলে দিচ্ছে। আঁচলে ঠোঁট মুছে অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করে বসেছিল সীতা। অস্ফুটে শুধু বলেছিলঃ 'এই সুযোগটুকুর জন্যে তুমি এমন মন খারাপ করো যে আমার খারাপ লাগে।' নিখিলেশ কোনো উত্তর করেছিল কী? মনে পড়ে না। কিশোরের মতো একমাথা-চুল ভীরু লজ্জায় নরম ওর মুখটা দেখে নিশ্বাস ফেলেছিল সীতা। বস্তুত প্রথম থেকেই ওর সঙ্গে সম্পর্কটা একটা উদ্‌বেগের কাঁটায় খরতর লাগত। নিখিলেশের সমূহ ইচ্ছাগুলো একটু সুযোগের সন্ধানে অসুস্থ হয়ে উঠেছিল। ও ভিড় ভালোবাসতো না, বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যও নয়। ও কী তাহলে পুরোমাত্রায় অসামাজিক ছিল! নাঃ নিখিলের স্মৃতির একটি নির্দিষ্ট চরিত্র সীতার দর্পণে ধরা রেই। সীতাকে বাদ দিয়ে ওর বাইরের জীবনটার কী কোনো আদর্শ ছিল? কোনো দিন নিখিলেশ তার কোনো সমস্যা নিয়ে সীতার কাছে আসেনি। সীতা তো ওর জীবনের পুরো অংশ নয়, খণ্ড মাত্র, সেই অসম্পূর্ণাঙ্গ মানুষটাকে কোনো দিনও বুঝতে পারল না ও। নাকি ও ওর প্রয়োজনের হিসেবের বাইরে কোনো দিন সীতাকে গণ্য করেনি। কিংবা ও হয়তো ভেবেছিল মেয়েদের শস্তা শরীর-চেতনার উর্ধ্বে আর কোনো জীবন নেই।

'সীতা খাবি আয়।'

মা ডাকছে। এবার নীচে নেমে যেতে হবে। কত রাত হল? তাই আজ দশ-এগারো বছর পরেও দুজনের সম্পর্কটার কোনো উন্নতি হল না। যেমন ছিল তেমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। নিখিলেশ তার স্বভাবের বাইরে এক চুলও নড়েনি। তাই একদা যেমন ঘনঘন দেখা করেছে তেমনি এক সময় ডুবও মেরেছে। ডুব-দেয়া অবস্থায় প্রথম দিকে খারাপ লাগলে সীতাই খোঁজ নিয়েছে। এবং যখন জেনেছে ওর এই অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা নিছক অর্থহীন খেয়াল, তারপর আর খবর নিতে চেষ্টা করেনি। সীতা বেশ বুঝেছে ওর আসা-না-আসার ব্যাপারটা ওর নিজস্ব। সেখানে সীতারও কোনো জোর খাটবে না।

নিখিলেশের এই সৃষ্টিছাড়া মেজাজটা সীতার রপ্ত হয়ে গেছে। ও একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলে একটা কথা ছিল। ও যে যে-কোনো সময়ে এসে ডাক

দেবে এই সম্ভাবনাটাই সীতাকে স্বাধীন হতে দেয় না। নিখিলেশ এই রকমই, সীতার জীবনধারার সঙ্গে ও এইভাবেই জড়িয়ে রয়েছে।

মা আবার ডাকছে। সীতা নিশ্বাস ফেলে নীচে নেমে এল।

শেষ রাত্রে পুলিশের কালো ভ্যান দরজায় এসে দাঁড়াল।

কড়া নাড়ার নিষ্ঠুর আওয়াজ।

মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল সীতার।

'আপনিই সীতা মিত্র? আপনাকে এখুনি একবার যেতে হবে।'

'কেন?'

'একটা আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে।'

'আমি! আচ্ছা আসছি।'

পুলিশ স্টেশনের বারান্দার কোণে চাদরে আবৃত ডেড বডি।

'মিলিটারি কর্ডন ভেঙে লোকটি শ্যামবাজারের দিকে ছুটে আসছিল। বাগবাজার স্ট্রীটে সেনট্রি ওকে চ্যালেঞ্জ করে। শোনেনি। কর্তব্যরক্ষায় বুঝতেই পারছেন·' কনেস্টবল মুখের আবরণ সরিয়ে দিতে চিৎকার করতে গিয়ে পাথরের মতো কঠিন হয়ে দাঁড়াল সীতা।

'ওর পকেটে চিরকুটে আপনার নাম-ঠিকানা পাওয়া গেছে। দেখুন তো আপনি চিনতে পারেন কীনা···'

সীতা মূক।

'দেখুন ভালো করে···'

সীতা বলল: 'না।'

এর নাম সমাজদেহ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

রমাকে আজ আর সঙ্গে আনে নি রানী। কি হবে এনে। ও কেবল কাঁদে। বেচারী ছেলেমানুষ। এটা বোঝে না যে, চোখের জল ছোঁয়াচে। কান্না কি রানীরই পায় না? কিন্তু নিজেকে শক্ত না-রাখতে পারলে খোকনের কি দশা হবে— সেও ত সামলাতে পারবে না। আর এইসব থানার লোক বিরক্ত হয়ে ধমক দেবে। নয় ত রুখু মেজাজে তাগাদা দেবে,—'হয়েছে আপনাদের?' তারপরই হাত বাড়িয়ে দেবে খোকনের দিকে। তখুনি আবার লক-আপে ঢুকিয়ে দেবে। এক বছর ধরে জেল গেট দেখে রানী বুঝেছে, কান্নাকাটির কোনো দাম নেই।

আজ অবিশ্যি একা আসে নি রানী। একজন সঙ্গী জুটেছে। হৃদয়ের মা। হৃদয় আর খোকন যেমন একই সঙ্গে ধরা পড়েছিল তেমনি বরাবর এক জেলেই ছিল। আর আশ্চর্য দুই গার্জেনের দেখা করার দিন-সময়ও এক! এবারও জেল থেকে ওদের দুজনকেই বড় লোহার দরজার বাইরে পার করেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গাড়িতে তুলেছে। না, একটু হাঁটতেও দেয়নি জেলের বাইরে।

খোকনের সেই একটু হাসি আর ভারি গলায় কী শ্লেষ! কাল ও বলল— 'না মা, আমাদের এরা খুব যত্ন করে। নইলে ছ্যাখো, বাসে-ট্রামে বাদুড়-ঝোলা হয়ে আপিস যেতে বাড়ি ফিরতে কতো ধকল পোয়াতে হত। এরা একেবারে হাজির গাড়ি নিয়ে সেই সকাল থেকে, দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের জন্যে। বেরুতে যা দেরি!'

ছেলেটা এখনো ঠিক তেমনি তামাশা করে কথা বলে। তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ ভেঙে পড়ে। পুজোর পর যখন রানী জেলে দেখা করতে গিয়েছিল তখন খোকন বলেছিল—'আর পারছি না মা! বাপীকে বল, এক বছর ত হয়ে এল। এবার যেন আমায় ছাড়াবার জন্যে একটু চেষ্টা করেন!

হয়ত ছেড়ে দেবে তাহলে।' খুব সহজ সুরে বলতে গিয়েও ছেলেটার গলার স্বর কেমন বুজে এসেছিল!

বেচারী খোকনের বাপী। একা মানুষ সংসারের কোন্ দিকে নজর দেবে ভাবতেই দিশেহারা। রানীর কষ্ট হয় ওঁকে কিছু বলতে। অথচ বিধাতা এমনই করেছেন যে, দুনিয়ায় দ্বিতীয় কাউকে বলার সুযোগ নেই। ছিল যে সে ত এখন হিসেবের বাইরে। মাথায় কী যে পোকা ঢুকলো, নেশায় মেতে উঠল। কিছু বলতে গেলে, বাধা দিতে চেষ্টা করলে ভুরু কুঁচকে বিচিত্র হাসির আমেজ ছড়িয়ে জবাব দিত—'তুমি বোঝো না মা, অন্যায়-অবিচার আর অত্যাচারের মোকাবিলা করার দিন এসেছে। সবাই যদি মুখ বুজে এইভাবে মার খেয়ে যায় তাহলে মানুষের কষ্ট কোনো দিন ঘুচবে না। জবাব দিতে হবে।' কিংবা কখনো বলত—'এমন কোনো কাজ করব না যাতে তোমাদের ক্ষতি হয়।' খোকনের বাপী এক-একদিন খেপে গিয়ে ছেলেকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার হুমকিতে ফেটে পড়তেন। আশ্চর্য, মাথা হেঁট করে সেই বকুনি মুখ বুজে হজম করত।

পুরনো দিনের ছবিতে রানী নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। পাশ থেকে হৃদয়ের মা হঠাৎ বললেন—'দিদি, দেখুন ত ওই লোকটা কিনা!'

দুই ছেলের দুটি জননী প্রতীক্ষা করছেন একটি মানুষের জন্য। যিনি কাল আশ্বাস দিয়েছিলেন—'রোজ আসবেন। ছেলেকে দেখে যাবেন—কোনো অসুবিধে হবে না।'

চমকে রানী তাকাল—'কে? কই!' ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। বারান্দাটায় পড়ন্ত বিকেলের ছায়া। বাইরে বেরিয়ে, চলে যাওয়া লোকটির ওপর নজর বুলিয়ে মুখ আঁধার করে দাঁড়িয়ে রইল রানী। বারান্দার নিচে উঠোন। উঠোনে ব্যাডমিণ্টনের কোর্টে চারটি ছেলে খেলছে। ওরা খোকনের চেয়ে বয়েসে একটু কম! রানীর শূন্যদৃষ্টি ওদের ওপর দিয়ে তিন-চার বছর পেরিয়ে গেছে। ছেলের খেলার শখ হয়েছে। বাপের পুরনো বেঁকে-যাওয়া র‍্যাকেটখানা দিয়ে মেরামতের কসরত করছে। নতুন ত কেনার পয়সা নেই। পারতো ছেলেটা। মাথা খাটিয়ে ঘরের আলনা তৈরি, বাথরুমে একটা কাঠের ডাণ্ডাকে পাড় দিয়ে ঝুলিয়ে কেমন সুন্দর কাপড় গামছা রাখার ব্যবস্থা করেছিল—সেটা আজও আছে···'আপনি এখানে দাঁড়াবেন না। ঘরে গিয়ে বসতে বললাম যে!' গোঁফওয়ালা বদ

মেজাজী সেপাইটার ধমকে রানী আবার নিজের চেয়ারে এসে বসল। দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মুখ দিয়ে শুধু বেরলো—'না দিদি। তিনি নন্!'

থানার আপিস ঘর তিনখানা টেবিলে কাজ আর গল্প চলছে। দুটি মহিলা চতুর্থ টেবিলে মুখোমুখি দুই চেয়ারে বসে। হৃদয়ের মা অধীরভাবে বললেন— 'অনেকক্ষণ ত হয়ে গেল দিদি, কই তিনি ত এলেন না।'

একটি মেয়ে ঢুকলো। তার পিছনে বছর ত্রিশ বয়সের একজন দোহারা ভদ্রলোক। মহিলা দুজনকে দখে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন- 'আপনারা?'

ও-পাশের টেবিল থেকে একজন বললেন—'ওঁরা কেষ্টো বাবুর জন্যে বসে আছেন।'

রানীর মনে হল নবাগত ভদ্রলোক হয়ত সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন তাই সহানুভূতি উদ্রেকের স্বরে বলল—'দেখুন, কেষ্টো বাবু আমায় বলেছিলেন ছেলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন। কালও তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তা ঘণ্টা দুই হল বসে আছি। তিনি ত এলেন না। আপনি যদি—'

ভদ্রলোক ফিরেও দেখলেন না। ও ধারের যে টেবিলে একজন বসে কাজ করছিল সে উঠে তাঁকে চেয়ার ছেড়ে দিতে বসে পড়লেন এবং উদাসীনভাবে জবাব দিলেন—'যিনি বলেছেন আপনাকে তিনিই ব্যবস্থা করবেন। জানেন ত লক-আপে থাকলে দেখা করার নিয়ম নেই।'

হৃদয়ের মা বললেন—'তিনি কখন আসবেন?'

—তা বলা যায় না। আসতেও পারেন, নাও পারেন।

—কি হবে দিদি কেষ্ট বাবু যদি না আসেন?

হৃদয়ের মায়ের এ কথার জবাবে রানী কিছুই বলে না। কী বলবে? রানীর ত তবু ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। হৃদয়কে যে কোথায় রাখা হয়েছে তা-ই জানতে পারে নি ওর বাড়ির লোক। তিন-চার দিন ধরে একবার লালবাজার, একবার এ-থানা, একবার ও-থানা দৌড়ে বেড়িয়েছে তনয় আর মলয়—হৃদয়ের দুই দাদা! যেখানেই গিয়েছে সেখানেই শুনেছে 'না আমরা বলতে পারবো না। দেখুন খোঁজ ক'রে লালবাজারে। হয়ত এস-বি, কি ডি-ডি থেকে ধরে থাকবে।' রমাকেও ত এই থানার লোক ওই কথা বলেছিল। অথচ রমা দেখেই লোকটিকে চিনতে পেরেছিল। সেই সবুজ সোয়েটার আর চোখের কোণে কাটা দাগ—ওই লোকটিই রমার ভাইকে হাত ধরে গাড়িতে তুলেছে।

সকাল থেকে আড়াই ঘণ্টা ওরা সবাই প্রতীক্ষা করছিল জেল গেটে। রমার আশা তার ভাই ছাড়া পেলে ট্যাকসি ডেকে বাড়ি নিয়ে যাবে। আর নানান থানার লোক গাড়ি নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল যাদের ছাড়া হবে তাদের তুলে নেবার জন্যে। রমা ত আর তা জানতো না। গাড়িতে যখন ওদের ওঠানো হয়—তখন খোকনই জোর গলায় বলেছিল—এই থানার নাম। ওরা গাড়িতে রমা বাসে—গন্তব্য এক হলেও গতির তারতম্যে রমার পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল। সবুজ সোয়েটার পরা লোকটা অম্লান বদনে রমার কথা এমন-ভাবে উড়িয়ে দিল যে বেচারী থ হয়ে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারেনি। রমা ঢোক গিলে আর একবার বোঝাতে গিয়ে আরও ধাক্কা খেয়েছিল। লোকটা বলেছিল—'আপনার ভুল হচ্ছে। এখান থেকে কেউ ওই জেলে যায় নি। আপনি—' রমা ছেলেমানুষ। একজন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানকে এ-রকম ডাহা মিছে কথা বলতে দেখে মনে মনে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়েছিল সে। থানায় আব এক-মুহূর্তও দাঁড়ায়নি। রানী আশায়-আশায় বসেছিল দুই ভাই-বোনে ফিরবে—কতোদিন পরে বাড়ির ছেলে ঘরে ফিরবে। বেলা দুটোর সময় ঝোড়ো কাকের মতো রমা ফিরেই কান্নায় ভেঙে পড়ল।

যে মেয়েটিকে নিয়ে এল সে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। বয়স সতেরো আঠারো হবে। রমার বয়সী। হয়ত দেখতে রমার চেয়ে ভালো, কিন্তু চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায় ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

ভদ্রলোক ভূমিকা করলেন—'এখন কেমন লাগছে বীণা? বিপ্লব এসে গেছে তাই না?' মেয়েটি জবাব দিল না।

—আচ্ছা বীণা, তুমি কি মনে করো কটা পুলিশকে খুন করতে পারলেই বিপ্লব হল। আর রাতারাতি দেশের চেহারা পালটে যাবে?

হৃদয়ের মা, রানী উভয়েই মুখ চাওয়াচায়ি করে।

ভদ্রলোক বোধহয় সেটা টের পেয়েছিলেন, বললেন—জানেন, যেদিন একটা পুলিশ মারা হত সেদিন বীণাদের বাড়িতে উৎসব হত। পোলাও মাংস খেয়ে ওরা আনন্দ করতো। কী বীণা তাই করতে না?

মেয়েটিকে বার কয়েক ওই একই প্রশ্ন করার পর ও শুধু ছোট্ট করে ঘাড় কাত করে জানালো কথাটা সত্যি।

জেরা চলল। ভদ্রলোক চিবিয়ে চিবিয়ে একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঁচ সাত

বার করে মেয়েটির ধৈর্য আর সহনশীলতার দুর্গ ভেদের চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছে। বৃদ্ধ এখন শেষ দিনের দিকে তাকিয়ে ক্যান্সারে শয্যাশায়ী। বীণাকে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা হয়েছিল, ওর বালিশের তলায় রিভলবার পাওয়া গেছে। ওর কাজই ছিল মাল পাচার করা। কতোদিন ধরে' কতোগুলো মারণাস্ত্র ওর হাত দিয়ে চালান হয়েছে তার হিসেব নেই। বেশ কিছুক্ষণ এই বিচিত্র কাহিনীর জালে রানী জড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েটা কেমন নির্বিকার। মাথাটা ওর একভাবে রয়েছে। পিঠের ওপর রুখু চুলগুলো পর্যন্ত নড়ছে না। রানী ভাবছিল ভদ্রলোকেরও অসীম ধৈর্য।

হৃদয়ের মা ওর গায়ে ঠেলা দিলে রানী চোখ তুলল।

রানী কাগজে মোড়া জামা আর পাজামার প্যাকেটটা দেখল, প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে আর একটা মোড়কে আছে নাড়ু। কলা, পাঁউরুটি আর দুটো কমলালেবু। কাল খোকন বলে দিয়েছিল, সাতদিন স্নান হয়নি, এক জামা-কাপড়ে কাটছে উপায় কি? আচ্ছা এই মেয়েটাকে কোথায় রেখেছে? ওরও কি স্নান বন্ধ? রানীর মনের মধ্যে মুহূর্তে যেন সব কিছু ওলট পালট করে দিচ্ছে। ইস্, কতো দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপিস থেকে রমার বাবা হয়ত এতক্ষণে ফিরেছেন। নিশ্চয় ব্যস্তভাবে পায়চারি করছেন আর সিগারেট টানছেন। বেশি সিগারেট খাওয়া বারণ, তবু—।

ঘরে মধ্যে দীর্ঘকায় একজন ঢুকলেন। দেখেই মনে হয় পদস্থ অফিসার। সবাই উঠে দাঁড়াল, কপালে হাত তুলে স্যালুট করল। রানী, হৃদয়ের মা দুজনে উঠলেন। গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে ভদ্রলোক চারদিকে নজর বুলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে রানী আর্তস্বরে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—'শুনছেন।'

হৃদয়ের মা কয়েক পা এগিয়ে ভাঙাভাঙা গলায় বললেন—দেখুন আমরা তিন ঘণ্টার ওপর বসে আছি। ছেলেকে একটু দেখবো, দেখেই চলে যাব।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন—লক-আপে ত দেখা করার নিয়ম নেই।

ভদ্রমহিলা কাতর কণ্ঠে বললেন—কত দূর থেকে এসেছি। এতদিন ত জানতেই পারিনি আপনারা এইখানে ওরে রেখেছেন। আমার ছেলেরা তিন-চার দিন এসে ঘুরে গেছে, কেউ সত্য কথা বলে নাই। এইভাবে ভুগিয়ে কি লাভ হয় বলেন ত! মায়ের দুঃখ।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। তারপর ঘরের কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

এঁদের কেন বসিয়ে রাখা হয়েছে।' পূর্ব মুহূর্তের হাসির সঙ্গে এই কথার সঙ্গতি খুঁজে পেল না রানী।

যিনি মেয়েটিকে জেরা করছিলেন তিনি ছাড়া আর সকলেই সমস্বরে জবাব দিল—দেখা হবে না একথা অনেকবার বলা হয়েছে, তবু যদি ওঁরা বসে থাকেন ত আমরা কি করতে পারি স্যার? মেয়েছেলের উপর ত আর জোর খাটানো যায় না।

ভদ্রলোক রানীর দিকে একবার চোখ রেখেই দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। এবং গম্ভীরভাবে বললেন—আপনারা কেন যে আসেন বুঝি না। যদি ফিরিয়ে দিই তখন দোষ দেবেন আমাদের। বেআইনি কাজই বা কি করে হতে দিই বলুন!

রানী বুঝতে পারে দেখা আজ হবে না। তবুও প্রশ্ন করে—দেখা না হলে এগুলো নিয়ে কি করি বলুন ত?

এবার তিনি সরাসরি তাকালেন—কী? এগুলো মানে—

খানিকটা ভরসা পেল রানী—খোকনের জামা-কাপড় এনেছিলাম! কাল ও বলে দিয়েছিল আনতে। আজ দশদিন ধরে একবস্ত্রে রয়েছে। স্নান পর্যন্ত হয়না। গায়ে একটা চাদর ছিল তাও ত আপনাদের আপিসে জমা করে নিয়েছে। না গামছা, না চাদর, এমন কি দাঁতমাজা মুখধোয়া, মাথা আঁচড়ানোর চিরুনিটি পর্যন্ত কাছে রাখা আপনাদের বারণ! ও বলেছিল জামা-টামা পালটে নেবে তাই এনেছি। আর এই নাড়ু তৈরি করেছি। কলা, কমলা, এই—

ভদ্রলোক নিজের হাত দুখানা মুঠো করে সামনের দিকে আস্তে আস্তে নাচাচ্ছিলেন—রানীর কথা শেষ হতে থামিয়ে বললেন—দেখুন, লক-আপ থেকে ওদের বার করা হবে না। আপনার যা দেবার সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে বাড়ির কোনো খাবার দেবার নিয়ম নেই—

হৃদয়ের মা বললেন—কেন? মা হয়ে ছেলেকে ত আর বিষ মিশিয়ে দেবেনা খাবারে।

ভদ্রলোক আবার হাসলেন।

রানীর বুক কেঁপে উঠল। লোকটার হাসিকে ওর ভয়।

সেই মুহূর্তে জেরা করা ভদ্রলোকের তীক্ষ্নস্বর ঘরখানায় ছড়িয়ে পড়ল—তুমি নেহাত মেয়েছেলে তাই গায়ে হাত দিতে পারছি না। নইলে চাবকে বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে বসে কথা কি করে বার করতে হয় দেখিয়ে দিতাম।

ওদিকে কান দেবার মতো অবকাশ নেই রানীর। উদগ্র আগ্রহে অফিসারের বেদবাণী শোনার জন্য ও মুহূর্তকে আটকে রেখেছে চোখের তারায়। হৃদয়ের মায়ের যুক্তি দিয়ে আর যা-ই হোক কাজের কাজ হবে না রানীর তা জানা হয়ে গেছে। ও বলল—আজ যখন এগুলো এনেছি কি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাই বলুন।

—ঠিক আছে। আর কখনো আনবেন না।

ভদ্রলোক হাঁক দিলেন—লক আপ।

একজন সেপাই এল।

অফিসার পদোচিত গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন—ওর হাতে দিয়ে দিন।

প্লাস্টিকের বালতি-ব্যাগটা হাতে তুলে রানী বলল—আমরা ওর সঙ্গে যাই নইলে ছাড়া কাপড়চোপড়—

—না-না কোনো চিন্তা করবেন না। একটু অপেক্ষা করুন লক-আপের ওই লোকই এনে দেবে।

লক-আপের লোহার মোটা গরাদ দেওয়া দরজাটা বারান্দা থেকে দেখা যায়। বার কয়েক দুই মা-ই সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এর আগে—যদি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দিচ্ছিল না থানার লোকেরা। অদ্ভুত এদের মেজাজ। নজরে পড়লেই তেড়ে আসছিল, হাঁকিয়ে দিচ্ছিল। এমন ভাব যেন লোহার গরাদ দিয়ে দেখা হলেই ওদের কেড়ে নিয়ে পালাবে এই মায়েরা।

হৃদয়ের মা বললেন—চলেন দিদি আমরা বাইরে যাই, এখানে এঁদের কাজের অসুবিধা হচ্ছে।

অফিসারটি এবার কিছু বললেন না।

বারান্দাটা ইংরেজি 'এল'-এর মতো। দুই লাইনের সংযোগস্থলে দাঁড়ালে একেবারে লক-আপ দরজার মুখোমুখি হয়ে ভেতরের দেয়াল অবধি নজর চলে যায়। একফালি বারান্দাটার বাঁ পাশেও থানার অফিস। সেখানে কর্ম-ব্যস্ততা। রানী অতি সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। বারান্দার নিচে মাঠে 'গেম-বল' হাঁক উঠল। এদিকে গরাদের লোহার লম্বা লোহাটার সঙ্গে মুখ-মাথা যতোটা ঠেলে দেওয়া যায় দিয়ে খোকন আর হৃদয় চেঁচিয়ে বলছে—মা তোমরা চেষ্টা করছ ত! বাপীকে বল আসতে, দাদাকে বল যেন তাড়াতাড়ি করতে। এখানে রাখবে না কিন্তু। খুব শিগগির। সোনা কাকা যেন আসে।

লক-আপের লোকটি ওদের আড়াল করে দাঁড়াল। ওরা দুজনেই হাঁটু

যুদ্ধে শ্রান্ত হয়ে দেখছে। রানীর বুকের মধ্যে কি অসহ্য কষ্ট। মনে হচ্ছে দেহের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে বেরিয়ে আসবে। হাত নেড়ে জানাতে চাইল অনেক অনেক কথা কিন্তু—! দেখেছে জেল গেটেও ঠিক এরকম হয়—গুছিয়ে রাখা সব কথাই হারিয়ে যায়। হাতড়ে খুঁজে পাওয়ার আগেই তাগিদ দেয় পিছনের বিধাতা। এমনিই হয়। কাল তবু পাশাপাশি চেয়ারে বসে কথা হয়েছিল। সে তো বার বারই বলেছে—'আমি আর পলিটিক্স করব না। ওঁরা যেমন ভাবে চান লিখে দেবো। বাপীকে বল দেরি হলে বিপদে ঠেলে দেবে কিন্তু।' রানীও বলেছে কাকে কাকে ধরা হয়েছে। খোকনের বাপী যে তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন সেটা ছেলেকে বুঝিয়েছে রানী। খোকন বলেছে মিথ্যা একটা চার্জ দাখিলে পুলিশ দিল তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে দাঁড় করানো হয়েছে। আবার তারিখ পড়েছে রবিবারে।

খোকনের মুখ এখন দেখা যাচ্ছে না। এই কালটুকুও রানীর মনকে খোকনের গত সন্ধ্যার সাক্ষাতের স্মৃতি জুড়ে দখল করেছে। থেকে থেকে ছেলেটা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, 'জানো ওদের কি মগজ মা। এদিকে লক-আপে আটক রেখে দিয়ে দিব্যি বলে দিল আমি নাকি ছাড়া পাওয়ার পরদিন রাত্রে বোমা পিস্তল নিয়ে সিনেমার সামনে দাঙ্গা করেছিলাম বুঝলে।' মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি জানি খোকনের হয় ত মনে হয়েছে যে, যথেষ্ট ধাক্কা লাগে নি, তাই পুনরাবৃত্তি করল—'বুঝলে মা! ভাবলেও হাসি পায়, ওরা কেমন মিছে কথা বানাতে পারে!' রানীর পাশে হৃদয়ের মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। টের পেল কিন্তু কিছু বলল না। বাধা দিয়ে কি হবে! আর কি বলেই সান্ত্বনা দেবে? সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে রেখে রানী পাশের অফিসের দ্বিতীয় দরজাটা পেরিয়ে গেল। বালতি ব্যাগ নিয়ে লোকটা আসছে। গরাদেতে আবার সেই মুখ, খোকন, হৃদয় 'আসবে। কাল এসো। বাপীকে বল। সোনা কাকা। দাদা···। চেষ্টা...'

বালতি ব্যাগ ফেরত দিয়ে লোকটি বলল—আর দাঁড়াবেন না। আমাদের শেষে ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

বন্দুকধারী দু'জন লোক আপিসের সামনে খট খট শব্দে এসে দাঁড়াল।

আর কি হবে। রানী শেষবার তৃষিত দৃষ্টি দিয়ে পিছন ফিরল।

হৃদয়ের মা হঠাৎ সামনের দিকে হন হন করে চলে গেলেন। লোকটি হাই

হই করে পিছু পিছু ছুটল। তিনি বাধ্য হয়ে গর্জে উঠলেন—খেয়ে ফেলবে নাকি! একি অন্যায়। চোখের দেখা একটু কাছে গিয়ে, তাতেও—

রানী এবার এগিয়ে তাঁর হাত ধরল—চলুন দিদি। কি হবে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে?

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তিনি মাঠের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—এগুলো কি মানুষ?

ত্বরিতপদে রানী তাঁকে কতকটা জোর করে জনখানেক পুলিশ আর সি-আর-পি-ই হবে (নইলে পোশাক আলাদা কেন হবে! এটা রানী কাউকে জিগ্যেস না করে নিজেই ধারণা করে নিয়েছে)—তাদের পেরিয়ে খোলা আকাশের নিচে নামল।

তারপর স্বগতভাবেই বলল—ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই দিদি।

—আপনিই বলুন ভাই, আমরা দাঙ্গাও করিনি, ছেলেকে ছিনিয়ে নিতেও আসিনি। কিন্তু এমন ভাব করে—

থানার এলাকা পেরিয়ে বিরাট চওড়া রাস্তা। হরদম বড় বড় ট্রাক, বাস, নানা ধরনের গাড়ি চলছে। এখানে দাঁড়ালে মনে হয় যেন অন্য জগত!

রানী বলল—দেখুন সব বুঝেশুনেও মুখ বুজে সইতে হয়। সবই ত ওই ছেলেগুলোর মুখ চেয়ে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

—তা সত্যি। সত্যি কোনো উপায় নাই। বড় ছেলেটা আজ কদিন কি দৌড়নই না দৌড়াচ্ছে, আর তেমনি দু-হাতে খরচও করছে। কাজ কারবার দেখারও ফুরসত পায় না দিদি। এত করেও যদি হৃদয়কে ছাড়াতে না পারা যায় তাহলে কি হবে ভগবানই জানেন।

রানী বলল—আমাদের উনিই কি কম করছেন! নবকংগ্রেসের লিডারকে ধরা থেকে শুরু করে সরকারি বড় কর্তা কিছুই বাদ নেই।

—আপনার কর্তার ত অনেক জানাশোনা! নইলে আজও হয়ত হৃদয়ের খোঁজ বার করা যেত না।

—না দিদি জানাশুনো দিয়েও কিছু কাজ হচ্ছে না। দেখলেন ত এদের ব্যাভার। টাকা ছড়াতে পারলে কোনো ভাবনাই ছিল না।

কথাটা রানীর পছন্দ হল না। কি জানি ওর ধারণা শুধু টাকা পয়সায় এ সমস্যার মীমাংসা হবার নয়। এই এক বছরে ওর যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে

বুঝেছে ব্যাপারটা খুব জটিল। অনেক ধনীর দুলালকেও রানী জালের ওপারে মলিন মুখে লোহার রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। তাদের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয় টাকা ঢালতে কার্পণ্য করে নি। আসলে সরকারপক্ষ কতকগুলি ধারণার বশেই এমন একটা পথ বেছে নিয়েছে যাতে রানী বা হৃদয়ের মায়ের কোনোদিক দিয়ে আশা-ভরসা আশ্বাস মিলছে না।

হৃদয়ের মা বললেন—এখন কি করবে ?

—বাড়ি যাবো। রান্নাও ত করতে হবে। উনি হয়ত ভাবছেন—!

একখানা বড় ট্রাক ঝকড়-ঝকড় করে চলে গেল। হৃদয়ের মা চোখ মুছে বললেন—না তা বলছি না। কাল আসবেন ত ?

—আসতে হবে। আপনার ত শরীর ভালো না—

—হ্যাঁ। আজ ত ছেলেদের লুকিয়েই এসেছি। কাল ওদের পাঠিয়ে দেবো ভাবছি। যদি ওরা টাকাপয়সা দিয়ে বাইরে এনে কথা বলতে পারে দেখুক চেষ্টা করে।

যুক্তিটা মন্দ নয়। কেন না এর আগে যে থানার লক্‌-আপে ছিল সেখানে ওইভাবেই নিচের তলার লোকদের সাহায্য মিলেছিল। তবে এটা শোনা কথা—সত্যিমিথ্যে কিছু জানা নেই রানীর। খোকনের বাপী এ থানা ও-থানা ঘুরে শেষে ওখানে গিয়ে ছাখেন বড় কর্তা পুরনো বন্ধু। তিনি অনেক সুযোগ করে দিয়েছিলেন এবং পরামর্শও দিয়েছেন কাকে ধরলে কাজ হবে। তদবির করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সরকারী মহল প্রায় অনড়। তাঁদের কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না যে এই ছেলেদের আবার সমাজের সাধারণ জীবনে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া দরকার। তাঁরা ভাবছেন এদের আটকে রাখলেই আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হবে। রানীর স্বামীকে একজন বড় অফিসার বলেই দিয়েছেন—'ফিরে এলে এরা যে আবার আর দশটা ছেলের মগজে ভ্রান্ত পথের বিষ ঢুকিয়ে দেবে না এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। মশাই, এক্সপেরিমেণ্ট করার মতো অবস্থা আর নেই।'

আরও সাত-সতেরো রকমের চিন্তার এলোমেলো ধাক্কায় রানী কেমন দিশেহারা বোধ করে। এর মধ্যে কখন হৃদয়ের মা বিদায় নিয়ে বাসে উঠে চলে গেছেন, কখন রানীর চোখের সামনে দিয়ে ওর বাড়ি যাবার বাসগুলো থেমেছে ছেড়েছে রানী দেখেও ছাখে নি। ওঠবার কথা মনেই পড়ে নি। ওর কেবলই মনে হচ্ছে, এইভাবে আর কতোকাল ছেলেটাকে

কাটাতে হবে, তার বাবার উদয়াস্ত খাটুনিতে শরীরটা আরও ভেঙে পড়বে—দেখতে হবে, কিন্তু করার মতো কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা ওই মেয়েটা যাকে জেরা করা হচ্ছে, ওরই বা ভবিষ্যত কী! আচ্ছা, এই যে মিথ্যে একটা দাঙ্গার দায়ে খোকনকে জড়ানো হয়েছে সত্যিই কি এর জন্য ওকে সাজা খাটতে হবে! রমার কথা ভাবলে আরও কষ্ট হয়—ওর নরম মনটা কিভাবে এরা বিষিয়ে দিচ্ছে। রমা ত এখন পুলিশের নাম শুনলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে। কিন্তু ছেলের কাকা পুলিশে চাকরি করেন এতেই রমার দারুণ আপত্তি। কাল বলে দিয়েছে ওখানে যদি বিয়ে দাও তার আগে আমি বিষ খাবো।

পর পর দুখানা কালো ভ্যান চোখের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে রানীর বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগল। চমকে উঠে ও চলতে শুরু করল। না, বাসে উঠবে না। বরং সেই পয়সা দিয়ে কাল খোকনের জন্যে দুটো কলা কেনা যাবে। এই ত এইটুকু পথ, গলিগলি হাঁটলে কতোই আর সময় লাগবে! তবু ত কিছু সাশ্রয় হবে সংসারের।

লোহার গরাদ ধরে দুটো শুকনো মুখ। মাটিতে বসে পড়ে ওরা বলছে—'তাড়াতাড়ি করো নইলে দেরি হয়ে যাবে। আবার এস।' আর তাদের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইছে বন্দুকধারী অনেক-অনেক পল্টন, তাদের মুখ নেই সমস্তটাই পিঠ।

সামনাসামনি একটা লোক পথ আগলে দাঁড়িয়ে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে রানী আবার দেখল, লোকটা সরে এসেছে। পথ বন্ধ। রানী চায় নি ওই অসহায় ছেলেগুলোর কাছ থেকে মনকে সরাতে। কিন্তু এই জনবিরল পথে এইভাবে বাধা পেয়ে বিরক্ত হল, তারচেয়ে বেশি ভয়। বিভ্রান্ত হয়ে অন্যধারে যাবার চেষ্টা করবে কিনা ভাবতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রানী। মুখগুলি হারিয়ে গেল সেই মুহূর্তেই। সঙ্গীহারা রানীর চোখের সামনে ঘন অন্ধকার নেমে আসে।

অপরিচিত কণ্ঠস্বর—রাণু!

এবার মুখ তুলে তাকাল রানী—তুমি?

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রানী বুঝতে চেষ্টা করে তার মনের ভাব। আর বলে—বাড়ি ফিরছি না বলে খুঁজতে বেরিয়েছ? খুব রাগ করেছ, হাঁ গো!

বিরাম চৌধুরী ক্লান্তি মুছে ফেলে বললেন—চলো একসঙ্গেই ফিরি।

—তার মানে, তুমি আপিস থেকে বাড়ি যাও নি?

—না। এই খোকনের ব্যাপারে একজনের কাছে একটু কনসাল্ট করতে এলাম। কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল। আমার ভয়ই হচ্ছিল, বাড়ি গিয়ে বকুনি খেতে হবে।

—এখানে কে? তোমার সেই উকিল বন্ধু রমণীবাবু?

—হ্যাঁ।

—তা উনি কি বললেন?

—বললেন মিথ্যে মামলার বিরুদ্ধে লড়ে কোনো লাভ হবে না। বরং বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে ছেলেটাকে তার জের সামলাতে হবে। ওরা যা চায় তা-ই মেনে নিতে হবে। এছাড়া কোনো পথ নেই।

রানী একটু হাসল।

—হাসলে যে!

—এমনি।

—চলো।

—হ্যাঁ, পথের মধ্যে এইভাবে বেশিক্ষণ থাকলে লোকেই বা ভাববে কি!

—ছাখো—

—বলো।

—আমাদের জীবনটা মেনে নিতে নিতেই শেষ হবে একদিন।

—কি রকম?

—এই একবার ওরা যা করল তা মানতে হল—

—আবার এখন এরা যা করবে তাও না-মেনে উপায় নেই।

ওরা চলতে চলতে কথা বলছিল। এক সময়ে কথা ফুরিয়ে শুধু চলার গতি নীরবতার পাশাপাশি সময়কে টানতে থাকল। একজন দেখল দেয়ালে মুছে আসা লিপির সারি আর কতকগুলি দেয়ালে নতুন হরফের তাজা কালিতে দেয়াল ভর্তি। আর একজনের চোখের সামনে সেই মুখগুলি, সেই পিঠ ফিরে এল॥

অভিনয়

মানবেন্দ্র পাল

ভবেন্দু মজুমদার সম্প্রতি দেশের পরিস্থিতিতে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

তিনি এই মহকুমা শহরের একজন বিখ্যাত লোক। শুধু মস্ত বড়ো ব্যাবসাদার বলেই নয়—ব্যাবসা তো অনেকেই করে কিন্তু ইনি ব্যাবসাদার হলেও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি।

মিসেস মজুমদারও শহরে একটা-না-একটা কিছু নিয়েই আছেন। আজ বন্যার্তদের সাহায্যে নাট্যানুষ্ঠান, কাল 'বাংলা দেশ'-আগত শরণার্থীদের সাহায্যার্থে বিচিত্রানুষ্ঠান, পরশু প্রাইমারি ইস্কুলের দ্বিতল তোলার জন্য চাঁদা আদায় ইত্যাদি। সঙ্গে মিস্টার মজুমদারও আছেন—অন্তত চাঁদার লিস্টে প্রথমেই তাঁর নাম দেদীপ্যমান।

ভবেন্দু মজুমদার খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছেন এই জন্য যে, প্রতিদিনের এই হাঙ্গামায় তাঁদের সংস্কৃতিচর্চা বিশেষভাবে ব্যাঘাত পাচ্ছে। কিছুদিন আগেও হাঙ্গামাগুলো কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু এখন মফস্বলেও শুরু হয়েছে। রোজ দুমদাম বোমা ফাটছে যেখানে-সেখানে যখন-তখন। ইস্কুলগুলোয় স্ট্রাইক তো লেগেই আছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা বন্ধ। তারপর দেওয়ালে দেওয়ালে কতরকমের পোস্টার! আর সে সব পোস্টারে 'গলাকাটা' 'বদলা' 'লাল সেলাম' ছাড়া আর কোনো কথা নেই। কাজেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা প্রায় বন্ধ।

ভবেন্দু মজুমদার খুব মনোযোগ দিয়ে রোজ কাগজ পড়েন। নিয়মিত কাগজ পড়ে কতকগুলো কথা তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। তিনি প্রায়ই বাড়িতে সোফায় গা এলিয়ে চা খেতে খেতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করেন। বলেন, 'খুনোখুনির রাজনীতি' চলতে দেওয়া উচিত নয় 'অবিলম্বে' বন্ধ করা উচিত। তাঁর মতে 'দুষ্কৃতকারীরা' সকলেই এক একটি রাজনৈতিক 'ছত্রচ্ছায়ায় পুষ্ট'। কাজেই এইসব রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে সরকারের 'কঠোর ব্যবস্থা' নেওয়া উচিত। তিনি সময়ে সময়ে 'পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা' সম্বন্ধেও

বাড়িতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু মিসেস মজুমদারের চোখের ইঙ্গিতে তখনই থেমে যান। কে জানে কাছে পিঠে পুলিশের লোক নেই তো? কারণ পুলিশের ওপর তাঁকে অনেক বিষয়ে নির্ভর করতে হয়।

খুব একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মজুমদার দম্পতি এবার খুব জাঁক-জমক করে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনে মনস্থ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমারসভা' নাটকটি বেশ হাসির। এটি এবার মঞ্চস্থ করতেই হবে।

বেলা ন'টা থেকে জোর রিহার্সাল চলছিল। ভবেন্দু মজুমদার ছেলে মেয়েদের পার্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে অভিনয় জিনিসটা কি—সে সম্বন্ধে প্লেটো থেকে অনন্দবর্ধন কোথায় কি বলেছেন তা শ্লোক আউড়ে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর মতে সবাই অভিনেতা-অভিনেত্রী হতে পারে না। ওটা ভগবদ্দত্ত প্রতিভা। তবে কার ভেতর প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা তো হঠাৎ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সেই জন্যেই তাদের 'প্রতিভাস্ফুরণে'র এইসব সুযোগ করে দিতে হয়।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা যারা তাদের 'প্রতিভাস্ফুরণে'র এই দুর্লভ সুযোগ লাভ করবার জন্যে জমায়েত হয়েছে তারা সবাই ভবেন্দু মজুমদারের এই জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রদ্ধাসহকারে শুনল। কেউ কেউ অবশ্য বাড়ি যাবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। কারণ ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে কাঁটা ঝুলে গেছে।

কিন্তু সংস্কৃতিপাগল ভবেন্দু মজুমদারের বাহ্যজ্ঞান নেই। তিনি বললেন, আচ্ছা ফার্স্ট সীনটা আর একবার করো দিকি।

অভিনয়ের মহড়া আবার শুরু হল। এমনি সময় দরজা ঠেলে ঢুকল পিওন।

—রেজিস্ট্রি আছে।

এই রকম রেজেস্ট্রি প্রায়ই আসে। পিওনও চেনা—মহাদেব সাঁতরা। কিন্তু আজ তাকেই দেখে ভবেন্দু মজুমদার চমকে উঠলেন। শুধু তিনিই চমকালেন না, অভিনেতারাও কেমন একরকমভাবে মহাদেব পিওনের দিকে তাকালো। কিন্তু মহাদেব সাঁতরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না। সই করিয়ে নিয়ে চিঠির ব্যাগ কাঁধে ফেলে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

সেদিন আর মহড়া জমল না। সকলেরই চোখে মুখেই কেমন যেন ত্রস্ত ভাব। ভবেন্দু মজুমদার যেন কেমন হয়ে গেলেন। মহাদেব সাঁতরা হঠাৎ একটা দুর্গ্রহের মতো হাজির হয়ে সব ওলোটপালোট করে দিয়ে চলে গেল।

ভবেন্দু বললেন, আজ আর থাক্। তোরা বাড়ি যা।

বাইরের ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে ভবেন্দু ব্যস্ত হয়ে ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে চুপি চুপি বললেন, মহাদেবকে দেখলাম।

—কোন্ মহাদেব গো ?

—চুপ! মহাদেব সাঁতরা—পিওন।

—ওমা সেকী! কোথায় দেখলে ?

—আমাদের বাড়ি। চিঠি দিয়ে গেল!

—মহাদেব তাহলে বেরোচ্ছে!

—শুধু বেরুচ্ছে নয়, বহাল-তবিয়তে কাজ করছে।

—কী করে যে করছে কে জানে। ও কিছু বলল ?

—কিছুমাত্র না। যেমন অন্যদিন রেজিস্ট্রি সই করিয়ে নিয়ে যায় তেমনি নিঃশব্দে সই করিয়ে নিয়ে গেল।

—চোখমুখের ভাব ?

—আমি তো কোনো পরিবর্তন দেখলাম না।

—তাহলে কি যা রটেছে তা গুজব ?

এবার ভবেন্দু গর্জন করে উঠলেন।

—কখনোই গুজব নয়। দেশশুদ্ধু লোক বলছে। এই যে মেয়েগুলো রিহার্সাল দিতে এসেছিল তারা পর্যন্ত মহাদেবকে দেখে থ'। আর রিহার্সাল দিতে পারল না। গুজব বললেই হল!

মিসেস মজুমদার বললেন, কেউ কি ওদের জিজ্ঞেস করছে না, অনিল কোথায় ?

মিস্টার মজুমদার বললেন, করছে বইকি। ওরা বলে বেড়াচ্ছে অনিল কলকাতায় আছে।

মিসেস মজুমদার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, রাধেশ্যামের মন্দিরে রোজ সন্ধ্যেবেলায় মহাদেবের বউটা রামায়ণ শুনতে আসে। আজ আমিও যাব। দেখি বউটা আসে কিনা।

—তুমি যেন আবার কিছু জিজ্ঞেস করে বোসো না। তাহলে সাত কৈফিয়তের মধ্যে পড়বে। আজকাল তো আর কেউ বড়োর সম্মান রেখে কথা বলে না।

মিসেস মজুমদার ঝংকার দিয়ে বললেন, সে আর আমায় শেখাতে হবে না। যার তার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভারি দায় পড়েছে। এক নজর

দেখলেই বুঝতে পারব। তা ছাড়া আমি বাজি ধরতে পারি মহাদেবের বউ এখন কিছু দিন—অন্তত বছর খানেক, কোথাও বেরোতে পারবে না। কোন্ মুখে বেরোবে ?

রাত্রিবেলায় শয়নমন্দিরে স্বামীস্ত্রীর দেখা হল।

ভবেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, মহাদেবের বউ গিয়েছিল ?

মিসেস মজুমদারের মুখ বেজায় গম্ভীর। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বললেন, হাঁা, গিয়েছিল। শুধু যাওয়াই নয়, একেবারে প্রথম সারিতে নামাবলী গায়ে দিয়ে ভক্তিগদ্‌গদ হয়ে বসেছিল। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

—তা হলে ব্যাপারটা কি ? সবটাই রটনা ? কিন্তু সেদিনের পর অনিলকে কি আর দেখেছ ?

মিসেস মজুমদার বিরক্ত হয়ে বললেন, কে আর তা লক্ষ্য করেছে ?

বলে পাশ ফিরে শুলেন।

মিসেস মজুমদার পাশ ফিরে শুয়ে ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও মিস্টার মজুমদার অত সহজে পাশ ফিরতে পারলেন না। হাজার হোক তিনি পুরুষ মানুষ। তাঁর দায়িত্ব অনেক—ভাবনা চিন্তা অনন্ত।

মিসেসকে বিরক্ত না করে অথচ শুনিয়ে শুনিয়ে যেন স্বগত বললেন, বাড়িটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি জড়িয়ে না যাই। আসামীরা ধরা পড়লে বা শেষ হয়ে গেলে ঝড় ঝাপটা তাদের ওপর দিয়েই যেত। কিন্তু এখন পুলিশ দেখবে, কাউকে পাচ্ছি না তবে বেঁড়ে শেয়ালকেই ধর।

মিসেস মজুমার সেই এক-কাতে শুয়ে শুয়েই বললেন, আহা, বাড়িতো আর আমাদের নয়। অন্যের বাড়ি—আমাদের কাছে বাঁধা আছে। তা ছাড়া ও বাড়িতে কেউ থাকে না। তালা বন্ধ।

মজুমদার বললেন, সে তো তুমি বুঝলে আর আমি বুঝলাম। কিন্তু পুলিশ ? তারা বলবে ওই বাড়িতে যখন ঘটনা ঘটেছে—আর বাড়ির চাবি যখন আমাদের কাছে তখন নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে ওদের ষড়যন্ত্র আছে।

মিসেস মজুমদার এবার সোজা হয়ে শুলেন। গলার স্বরে যেন ভয়-ভয় ভাব। বললেন, কিন্তু ছেলেগুলো তো পাঁচিল টপকে ঢুকেছে। বাইরের দরজায় যেমন তালা ছিল তেমনই রয়েছে।

মজুমদার বললেন, সে কথা পুলিশ শুনবে না। ইচ্ছে করলে হাজার প্রসঙ্গ তুলে তালাটা একটা অছিলা বলে আমাদের জব্দ করতে পারে।

মিলেস মজুমদার এবার আঁতকে উঠে বললেন, তা হলে উপায়?

ভবেশ বললেন, একমাত্র উপায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন। জাঁকিয়ে ফাংসনটা করো। পুলিশ অফিসারদের নিজে গিয়ে হাতে হাতে কার্ড দিয়ে এসো। ওরা বুঝুক আমরা বোমা ফাটাফাটির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না, আর যেহেতু ও বাড়ি আমাদের নয়—ও বাড়িতে আমরা বাস করি না সেইজন্যে কী ঘটছে তা নিয়ে আমরা ভাবি না। আমাদের ভাবনা সংস্কৃতির ভাবনা। কেমন করে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবটা সাকসেসফুল করা যায় এই আমাদের ধ্যানজ্ঞান। অর্থাৎ এক কথায় তোমাকে আমাকে নিখুঁত অভিনয় করতে হবে। স্টেজে নয় —ঘরে বাইরে রাস্তায় ঘাটে পুলিশ অফিসারদের সামনে। আমাদের মনের এক কোণে যে ভয় বাসা বেঁধেছে নিপুণ অভিনয়ে তা চাপা পড়ে যাবে। কারণ বুঝতেই পারছ ভয় থেকেই মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে। আর দুর্বল হয়ে পড়লেই সবলে গলা টিপে ধরবে।

কিছুদিন ধরেই এই ছোট্ট শহরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অশান্তি চলছিল। কিন্তু গত সপ্তাহে একটা বড়ো রকমের ঘটনা ঘটে গেল। রাত প্রায় দুটো—প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে শহর কেঁপে উঠল।

ভোর বেলায় দেখা গেল শহর থেকে মাইলখানেক দূরে একটা বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে। দরজা জানলা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়।

বোঝা গেল ফাঁকা বাড়ি পেয়ে এর ভেতরে বোমা বাঁধা হচ্ছিল। অসাবধানতায় এই দুর্ঘটনা।

কিন্তু আসামীরা? নিশ্চয় দু'এক জনের কাজ নয়। তারা গেল কোথায়? অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গেছে? অসম্ভব। কেননা মেঝেতে দেওয়ালে চাপ চাপ রক্ত তখনো তাজা।

বোঝা গেল দলের আর সব, বা পাড়া-প্রতিবেশী রাতারাতি হতাহতদের সরিয়ে ফেলেছে।

তারপর থেকে শহরে কত-না জল্পনা-কল্পনা।

কারা বোমা বাঁধছিল? তারা কি সব এখানকার ছেলে, না বাইরের? ক'জন ছিল? তাদের মধ্যে ক'জন হত ক'জন আহত? লাসগুলো কোথায় সরিয়ে ফেলা হল? আহতদের কোথায় রাখা হল? সরানো কাজ এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে করা সম্ভব হল কি করে? পুলিশ নাকি গোপনে তল্লাশ করছে। কিন্তু শহরের মধ্যে হতাহতদের কোনো চিহ্ন নেই।

যত জিজ্ঞাসা—যত সংশয় ততই গুজব। যে যা পারছে বলে বেড়াচ্ছে। সব গুজবের সাধারণ তত্ত্বগুলি একত্র করলে দাঁড়ায়—চার পাঁচটি তরুণ ছেলে বোমা বাঁধছিল। এদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই বাইরের। বোমা ফাটার শব্দে দলের লোকেরা এসে পড়ে। রাতারাতি তারাই আহতদের সবাইকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে দিয়েছে। এদের মধ্যে স্থানীয় যে ছেলেটি সে হচ্ছে অনিল—মহাদেব পিওনের ছেলে।

গুজবের তুটি ভাগ। কেউ বলে অনিল বেঁচে আছে, তবে চোখ গেছে। কারো মতে অনিল আর নেই।

খবর খুব চাপা। ফিসফিস করে কথা। কারণ পুলিশ নাকি তল্লাশ করে বেড়াচ্ছে।

তুদিন পরে আবার চাপা খবর—অনিল নাকি বেঁচেই ছিল, কিন্তু গত পরশু দিন মারা গেছে। এ একেবারে পাকা খবর। কেননা অনিলদের পাশের বাড়ির সবাই গতকাল অনিলের মাকে কাঁদতে শুনেছে।

একুশ বছরের একটি তরুণ প্রাণের এই অপচয়ে কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল কিনা জানা কঠিন তবে ভবেন্দু মজুমদার যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কারণ, ছেলেটা পোস্টার লিখত খুব। আবার বুক ফুলিয়ে চলত। তা ছাড়া এই মৃত্যু সত্য হলে পুলিশের রোষ অনিলের বাপমায়ের ওপরই গিয়ে পড়বে—বাড়ির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

কিন্তু অনিলের মৃত্যু খবরটাও স্রেফ গুজব হয়ে যেতে পারে। কিছুদিন পরেই হয়তো দেখা যাবে অনিল বুক ফুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার সেঁটে বেড়াচ্ছে।

অথচ এ ব্যাপারটা নিয়ে মহাদেব বা তার মায়ের কাছে তো কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না। সে সাহস কারো নেই। তাই শহরশুদ্ধ লোক—এমন কি মহাদেবের অন্তরঙ্গরাও—দূর থেকে কেবল তাকে লক্ষ্যই করছে। পুরুষরা করছে মহাদেবকে লক্ষ্য, মেয়েরা করছে মহাদেবের স্ত্রীকে লক্ষ্য। পুত্রশোক বলে কথা। তার কি কোন চিহ্ন ফুটে উঠবে না মা-বাপের চোখে মুখে, চলায় ফেরায়?

রাত হল।

পিওনের খাকি পোশাক দূরে ফেলে দিয়ে মহাদেব বিছানায় এসে শুলো। পাশে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে মহাদেবের স্ত্রী। কে বলবে—কিছুক্ষণ

আগেই নামাবলী জড়িয়ে ভক্তিভরে ঠাকুরবাড়িতে রামায়ণ শুনছিল। পাশের ঘরে অঘোর ঘুমোচ্ছে মহাদেবের ছোটো ছেলে শিবনাথ।

মহাদেব বিছানায় শোবামাত্র মহাদেবের স্ত্রী ফুঁপিয়ে উঠে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল। মহাদেব কোনো কথা বলতে পারল না। বলবার কিছু নেই। এমনি তো রোজ।

তবু মহাদেবকে বলতে হল, ধৈর্য ধরো।

—আর যে পারি না। ওগো আমায় একটু ডাক ছেড়ে কাঁদতে দাও।

বলেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মহাদেব তখনই স্ত্রীর মুখ চেপে ধরে কাতর স্বরে বলল: দোহাই তোমার চারিদিকে লোক ঘুরছে। কে কোথায় শুনতে পাবে—সব্বনাশ হয়ে যাবে।

শোকার্ত স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—আর কতকাল গো, আর কতকাল এমনি করে লোকের চোখ ভুলিয়ে চলব ?

মহাদেব শান্ত গম্ভীর স্বরে শুধু একই কথা বললে, ধৈর্য ধরো। চাকরিটা বজায় রাখতে হবে। শিবুটার ভবিষ্যত—

দূরে এমনি সময়ে কিসের যেন কোলাহল শোনা গেল। বিছানায় উঠে বসে জানালা দিয়ে মহাদেব দেখল, দূরে মাঠে স্টেজ বেঁধে মজুমদার দম্পতির উদ্যোগে নাটক অভিনয় হচ্ছে॥

আলোয় শুধু

মিহির সেন

মাঝে ক'দিন বন্ধ ছিল। আজ আবার সন্ধ্যার পর ঝিলটার কোণ থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ এসে সবাইকে সচকিত করে তুলল।

উৎকণ্ঠিত মুখগুলো জানলার শিকে ঝুঁকে অন্ধকার ঝিলটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

রেল লাইনের ওপারেই ঝিলটা। এখন বর্ষার কচুরিপানায় দূর থেকে দেখে মাঠ মনে হয়। আশে পাশে ঝোপঝাড়। ঝিলটার ওপারে জবর দখল বিরাট কলোনী। এপারে নতুন গড়ে-ওঠা বসতি। আগে নিচু জমিই ছিল, এখন ভরাট হয়ে অনেক বাড়ি উঠে গেছে। আগে দাম অনেক কম ছিল। সামান্য সঞ্চয় বা ধার-করা টাকায় মধ্যবিত্তরাই প্রথম এসে উঠেছিল তাই। এখন দাম আকাশ-ছোঁয়া। অভিজাতরাও নজর ফিরিয়েছে এদিকে। সম্প্রতি দু'এক বছর হলো খ্যাতনামা এক শিল্পপতিও প্রায় প্রাসাদতুল্য এক আবাস গড়েছেন। এ-পল্লীতে বাড়িটি এখনও বেমানান। কিন্তু আশেপাশে এখন নতুন ক'টি বাড়ির ভিত উঠছে, যেগুলো উঠে গেলে আর বেমানান মনে হবে না। তখন হয়তো ও-গুলোর পাশে পুরোন পল্লীটাকেই বেমানান প্রাচীন মনে হবে।

প্রথম আর্তনাদের পর ক্ষণিক বিরতি উৎকণ্ঠিত মুখগুলোকে আবার ঘরে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু উপর্যুপরি কতগুলো বোমার শব্দে আবার আঁতকে ওঠে সবাই।

গোটা ঝিলটা জুড়েই যেন তাণ্ডব চলছে। হইচই, চিৎকার, আর্তনাদ, বোমার শব্দ, পাইপ গানের গুলির শব্দ।

নিয়মিত অভ্যেস বশে মুহূর্তে সমস্ত বাড়িগুলোর দরজা জানালা শব্দ করে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল। অন্ধকার হয়ে গেল গোটা রাস্তা। মোড়ের পানের দোকানের ঝাপ বন্ধ হয়ে গেল। কোণের মুচির দোকানটার দরজা বন্ধ

হয়ে গেল। চোখের নিমেষে রেল লাইন ঘেঁষে বন্দা কাঁচা শাক-সবজির সান্ধ্য-বাজারটা উবে গেল যেন।

পাড়ার রাস্তাটা দিয়ে এক ঝাঁক উত্তেজিত পায়ের ছুটে যাবার শব্দ শোনা গেল।

গোটা পাড়া উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে। আসন্ন একটা আক্রমণের আশঙ্কায় ঘরে বসে কাঁপছে সবাই। প্রতিবাদের উপায় নেই। প্রতিরোধের শক্তি নেই। বিপদটা যদি এসেই পড়ে। গোটা তল্লাট জুড়ে আসবে। কারণ লড়াইটাও এ-তল্লাটের সঙ্গে ও-তল্লাটের। যুদ্ধের মতই। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি এখানে বিচার্য নয়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অন্ধকার ঝিলটা রণক্ষেত্র হয়ে থাকল। এতবড় সংঘর্ষ এই তল্লাটে এই প্রথম। অন্তত সাম্প্রতিক কালের ভেতর। এদিকের দুটি ছেলেকে নাকি কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারই জের কিনা কে জানে।

সুষমা আজ সকাল থেকেই কেমন যেন বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলেন। ছেলেগুলোর চলাফেরা, কথাবার্তায় কিসের যেন একটা চাপা প্রস্তুতি চলছিল। তপুর কাছেও দুচারজন বন্ধু এসেছিল। ওর জ্বর হয়েছে শুনে নাকি দেখতে এসেছে। কিন্তু ওরা যাবার পর ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে অশুভ একটা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠেছিল সুষমার।

সত্যি জবাব পাবেন না জেনেও জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওরা কি বলে গেল রে? তপু চোখ সরিয়ে নিয়ে শুকনো জবাব দিয়েছিল, অসুখ, তাই সাবধানে থাকতে।

সুষমা তবু একবার জিজ্ঞেস করলেন, শুধু তাই?

তপু মার চোখে চোখ রেখে বলল, যদি গোপন কিছুও বলে গিয়ে থাকে, সেটাতো গোপন রাখার জন্যই বলে গেছে। সব কথা জানবার এত আগ্রহ কেন তোমাদের?

ওর জবাবের চাপা বিরক্তি ও ধমকের সুরে মনে আঘাত পেয়েছিলেন সুষমা। নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলেন। তপুটা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে ওর বয়সে অপুও তো রাজনীতি করত! পুলিশের লাঠিগুলির সামনেও পড়েছে কতবার। জেল খেটেছে। কিন্তু অপুকে সুষমা পুরো বুঝতে পারতেন। সাধারণ কৃষক মজুরদের জন্য ওদের দরদে অনেক সময় ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস

থাকলেও, ওদের পথটাকে পুরো বুঝতে পারতেন। নিজের মতবাদ নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল তর্ক করত। কিন্তু শ্রদ্ধাও করত। অথচ তপুটাকে দেখে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় সুষমার, পারিবারিক বন্ধনগুলোকে কি ওরা পুরো অস্বীকার করতে চায়?

বেশ কিছুক্ষণ হয় ওদিক থেকে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না দেখে সুষমা সন্তর্পণে এবার রান্নাঘরের জানলাটা একটু ফাঁক করেন। দোতলার এই কোণটা থেকে ঝিলটা প্রায় পুরোই দেখা যায়। পাশের প্লটটায় বাড়ি উঠে গেলে আর দেখা যাবে না।

আবেগে, উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় বুকের ভেতর কি যেন একটা দলা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে সুষমার। হাত কাঁপছে। সমস্ত দেহ শিথিল হয়ে আসছে।

এত দূর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপঝাড়ে অন্ধকারে থমথম করছে ঝিলটা। কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। নিঃশব্দ, নিস্পন্দ, একটা বধ্যভূমির মতো পড়ে আছে জমাট অন্ধকারটা। কে বলবে একটু আগেই ওটা ছিল এক কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন।

ওদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বুকটা হু-হু-করে ওঠে সুষমার। কত মায়ের বুক খালি হলো কে জানে। এমনিতেই কিছু দিন হয় এক অভিশপ্ত বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে জায়গাটা। প্রায় রোজই একটা-দুটো করে সদ্য নিহত বা বিকৃত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় এখানে ওখানে। কিন্তু আজ আর গুপ্তহত্যা নয়, সম্মুখ সংঘর্ষ হয়ে গেল দু'দলের। কিন্তু আশ্চর্য, একটা লোকও তো এগিয়ে যায় না ওদের বাধা দিতে। ছেলেগুলোকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মিটমাট করে দিতে। মানুষগুলো কি সব আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছে? না, প্রাগৈতিহাসিক আপন স্বার্থবিদ্ধ পশু হয়ে গেছে? নিজের জীবনটাই যেখানে একমাত্র বিচার্য!

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে দীপা এসে রান্নাঘরে ঢুকল।

—মা, দাদা কোথায়?

চমকে ফিরে তাকান সুষমা। কেন, ঘরে নেই?

—না তো?

দীপার মুখ ফ্যাকাসে। গলা কাঁপছে কথা বলতে।

সুষমা ছুটে গেলেন তপুর ঘরের দিকে। বিছানা খালি। বাকি ঘর দুটোতে নেই। হঠাৎ কি যেন ভেবে ছুটে নিচের তলায় এলেন সুষমা। যা ভেবেছিলেন, তাই। সদর দরজার খিল খোলা।

ততক্ষণে অন্য ভাড়াটেরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সুষমা প্রায় কান্নার সুরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেউ তপুকে বাইরে যেতে দেখেছেন?

কারো পক্ষেই সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব হলো না। আতঙ্কে সবাই তখন যার যার বন্ধ ঘরে। নিজের সন্তানদের আগলাচ্ছে। তাছাড়া, তপুর উপস্থিতিই এ বাড়ির সবার কাছে এক অনুচ্চারিত আতঙ্ক। ওব জন্যই বিরুদ্ধ পক্ষর কাছে এ বাড়িটাও আজ চিহ্নিত।

সুষমা আবার ওপরে ছুটে গেলেন। তপুর বাবা এখনও বাড়ি ফেরেননি। অথবা, এ গোলমালের জন্যই ফিরতে পারেননি। কি করবেন বুঝতে পারছেন না সুষমা। দীপা বিছানায় ভেঙে পড়ে কাঁদছে। ছোট ভাইবোন দুটোও আতঙ্কে বোবা হয়ে টেবিলের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরামর্শ করার কেউ নেই। নিজেও যেন সব কিছু গুছিয়ে ভাবতে পারছেন না। হাত পা-গুলো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। অথচ এ অবস্থায় ঘরেও বসে থাকা যায় না। সম্ভব নয়। বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠছে অন্ধকার ঝিলটা। জ্বর গায়ে ছেলেটা যে কোথায় ছুটে গিয়েছে, সুষমা জানেন তা।

—লণ্ঠনটা কোথায়?

দীপা আস্তে মাথা তোলে। মাঝে বেশ কদিন ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ না হওয়ায় লণ্ঠনটা কে কোথায় রেখেছে কে জানে। কিন্তু হঠাৎ মা লণ্ঠনটা খুঁজছে, কেন বোঝেনা দীপা। আস্তে জিজ্ঞেস করে, কেন?

স্থির কণ্ঠে বলেন সুষমা, খুঁজে দেখে আসি।

ভয় পায় দীপা। গোটা তল্লাট যেখানে আতঙ্কে ঘরবন্দী, মা একা একজন মেয়েলোক সেখানে কোথায় খুঁজবে দাদাকে। কি করে খুঁজবে। অন্ধকারে ওৎপাতা আততায়ী ওখানে প্রতিটি ঝোপের আড়ালে। জিঘাংসা ওখানে নারী পুরুষ ভেদ মানে না।

কিন্তু কোন নিষেধ শুনলেন না সুষমা। লণ্ঠনটা খুঁজতে খুঁজতে অকম্পিত স্বরে বললেন, মা হলে বুঝতি কেন যাচ্ছি। পুরুষগুলো সব ক্লীব, পশু হয়ে গেলেও মায়েরা সন্তানের এই বিপদে চুপ করে থাকতে পারে না। আমার মন বলছে, তপু ওখানেই গেছে।

একটু বাদেই অন্ধকার নির্জন ঝিলটার পাড়ে ক্ষীণ একটা লণ্ঠনের আলোকে সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। কি যেন খুঁজছে কে। মাঝে মাঝে থেমে কি

যেন দেখে নিচ্ছে। তারপর আবার এগোচ্ছে। নীরন্ধ্র নিঃশব্দ অন্ধকারে একটা ভৌতিক আলোর বিন্দু ভেসে বেড়াচ্ছে যেন।

একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা হাত বেরিয়ে থাকতে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন সুষমা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি কিশোর দেহ। মাথা রক্তে জবজব করছে। পিঠের ওপর আমূল-বিদ্ধ একটা ছোরা।

না, তপু না। তবু সেখান থেকে নড়তে পারছেন না সুষমা। বুকের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চোখের সামনে যেন আপন সন্তানই অসহায় মৃত্যুর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

তপুর মুখই আবার সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল সুষমাকে। অন্ধকারকে খোবলাতে-খোবলাতে ক্ষীণ আলোর বৃত্তটা সুষমার পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল। ঝোপঝাড়গুলোর আড়াল খুঁজে বেড়াতে লাগল। এখানে-ওখানে বোমার পোড়া কাগজ, চাকু, ভোজালি, জামার টুকরো, বিক্ষিপ্ত জুতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে রক্তের ধারা, রক্তমাখা জল।

স্মৃতিভ্রষ্টের মতো সেই অন্ধকারে তপুকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন সুষমা। কতক্ষণ থেকে খুঁজে ফিরছেন ভুলে গেছেন। যেন কোন অনাদি অতীত কাল থেকে এভাবেই আপন সন্তানকে সন্ধান করে ফিরছেন। নিজের অস্তিত্বের এক খণ্ডাংশের অনুসন্ধানে এ যেন এক অন্তহীন যাত্রা।

ঝিলটার পুবকোণে একটা উঁচু মাটির ঢিপি ছিল। খুঁজতে-খুঁজতে সেটার কোণ কেটে ওপারে যেতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সুষমা। একটা স্তিমিত টর্চের আলো ওকে দেখেই যেন হঠাৎ নিবে গেল।

অজান্তেই অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কে ?

জবাবে একটা সবিস্ময় শব্দ গড়িয়ে এল সামনে থেকে, ঠাকুরঝি !

ব্যাটারি ফুরিয়ে-আসা ফ্যাকাসে টর্চের ফোকাসটা আবার সামনে ছড়িয়ে পড়ল। সেটায় পা রেখে-রেখে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে এলেন প্রায় সমবয়স্কা বউদি।

বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সুষমা, খোকনকে খুঁজছ ?

বউদি সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাঙা গলায় বললেন, হ্যাঁ। আমি জানতাম, একদিন এরকম একটা সর্বনাশ না ঘটিয়ে ও ছাড়বে না। তুমি তো জান ঠাকুরঝি পর-পর দুটো ছেলে মারা যাওয়ায় ওকে কিভাবে আগলে রেখে বড় করেছিলাম। চির রুগ্ণ ছেলেটাকে ধুঁকে ধুঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

আক্ষেপের স্বরে বলেন সুষমা, যেন মরণ নেশায় পেয়েছে ছেলেগুলোকে। কেন যে মরছে, কেন যে মারছে, কিছুই বুঝছি না।

বউদি আলগাভাবে বললেন, কিন্তু খোকনদের লড়তে হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য। তোমাদের ওদিকের ছেলেরা ওদের দেখলেই খুন করছিল।

সুষমার জবাবে ক্ষীণ প্রতিবাদ ফোটে, তা কেন বউদি। আমাদের পাড়ার ছেলেরাই তো বরং লাইনের ওপারে যেতে পারে না। কাল তপুদের দুতিনজন বন্ধুকে তোমাদের পাড়ার ছেলেরা ধরে নিয়ে যাওয়াতেই তো আজকের এই হাঙ্গামা।

বউদি দৃঢ়স্বরে বললেন, কিন্তু গত সপ্তাহে তপুদের দলের হাতে খোকনদের দলের দুটো ছেলে খুন হয়নি? রাগের মাথায় তার বদলা নিতে চেষ্টা করেছিল বোধহয় ওরা। ওরাও তো বয়সের ছেলে। রক্ত গরম।

সুষমা তিক্ত স্বরে বললেন, কিন্তু এসব যারা করছে তারা রক্ত গরমের জন্য করছে না বউদি, ঠাণ্ডা মাথাতেই করছে। এরা চিরদিনের গুণ্ডা বদমাইস এখন সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক দলের ভেতর ভিড়ে পড়েছে।

বউদি বোঝেন, খোকনদের দলের কথাই ইঙ্গিতে বলছে সুষমা। অথচ খোকনরাই সবসময় এই একই অভিযোগ করে তপুদের দলের বিরুদ্ধে। নিজের ছেলে বলেই ওদিকটা দেখতে চায় না সুষমা।

আস্তে বলেন বউদি, ঠিক একই অভিযোগ তো খোকনদেরও তপুদের দলের বিরুদ্ধে।

কোন জবাব দেন না সুষমা কথাটা পুরো অস্বীকার করতে পারেন না বলে। সব দলের ভেতরেই আজকাল এমন কিছু ছেলে ছোকরা চোখে পড়ে যাদের দেখে ভাল লাগে না। ভরসা করা যায় না। রাজনীতি না-বুঝলেও, এক সময় রাজনীতির জন্য আত্মবিসর্জন দিতে আসা যে সব ছেলেদের দেখে মনে-মনে সমীহ করতেন, শ্রদ্ধা করতেন, এ-মুখগুলোর সঙ্গে সে-সব মুখের মিল খুঁজে পান না। এমন কি অপু, খোকন, ওদের মুখের সঙ্গেও মেলে না যেন এই মুখগুলো।

নাম দুটো একসঙ্গে মনে পড়ায় সেই পুরোন দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সুষমার দেশ ছেড়ে সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তু হয়ে যখন একই সঙ্গে সব এখানে এসে উঠলেন, তপু খোকন তখন কতটুকু! কিন্তু কী ভাব ছিল দুজনের! সবাই দেখে আমোদ পেত। হাসাহাসি করত! পুতুলের মতো খেলত ওদের নিয়ে।

রেল লাইনের ওপারের জবর দখল কলোনীতেও একই সঙ্গে থাকত সবাই,

একান্নবর্তী পরিবার গড়ে। তপু, খোকন তখন আরো বড় হয়েছে। এক সঙ্গে গলাগলি করে স্লেট বই নিয়েই স্কুলে যেত দুজনে। একদিন দুজনেই সারা গায়ে কাদা মেখে জামা-প্যাণ্ট ছিঁড়ে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি এসে উপস্থিত। তপুকে নাকি ক্লাসের একটা গুণ্ডা-প্রকৃতির ছেলে মেরেছিল, তাই খোকন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দুই ভাই একই সঙ্গে মার খেয়ে ফিরে এসেছে।

এমন কি কয়েক বছর আগের সেদিনটার কথাও মনে পড়ে সুষমার। সবে তখন নিজেদের ছোট্ট একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় তুলে এপারে ওঠে এসেছেন।

তপু, খোকন দুজনেই কলেজে পড়ে। অপু রাজনীতি ছেড়ে দিলেও এক সময় ওর কাছ থেকেই পাঠ নেওয়া দুই ভাই তখন একই দলে। খোকনকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের মাথা ফাটিয়ে এসে হাজির তপু।

অথচ কোনখান দিয়ে যে কি হয়ে গেল, আজ তপুর মামাবাড়ি আসা বন্ধ। খোকনের পিসিবাড়ি। শুধু তাই নয়, দুই ভাই আজ রেল লাইনের দুপারে অতন্দ্র সশস্ত্র প্রহরী, একজনের ছায়া যেন আর একজনের তল্লাটে না পড়ে।

—ওখানে কি একটা পড়ে আছে না?

বউদির কথায় আবার চেতনায় ফেরেন সুষমা। ঝিলের জল ছুঁয়ে কালো মত কি যেন একটা পড়ে আছে। উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে ওঠা স্তিমিত লণ্ঠনের আলোর বৃত্তটা দুজনকে টেনে নিয়ে যায়।

না, মানুষ না। একটা পচা কলাগাছের ডুম। দুজনে নিঃশব্দে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যান।

ঝিলের দুপাশের গোটা বসতি এখনও অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। কেউ আলো জ্বালাতে সাহস পাচ্ছে না। দরজা খুলে এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। বোবা যন্ত্রণায় ঘরে-ঘরে সেই একই অসহায় প্রার্থনা গুমরে মরছে, ঈশ্বর, আমার কোল যেন খালি না হয়!

তারই ভেতর থেকে মাত্র দুটি অসহ্য যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা আতঙ্ক কখন যেন ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। অশরীরী দুটো ছায়ার মত অন্ধকারের বুক চিরে-চিরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাদের হারানো হৃৎপিণ্ড। একই যন্ত্রণার সূত্রে বাঁধা পড়া একটি একক সত্তার মত।

প্রতিটি মৃতদেহে আপন সন্তানের মুখের আদল খুঁজে বেড়াচ্ছিল সত্তাটি, দেহের খণ্ডিতাংশে আপন অস্তিত্বের অনুসন্ধান করছিল। অন্ধকার থেকে

একদিন যাদের আলোর উৎসবে এনেছিল, মৃত-আলোর অতল অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল তাদের।

একসময় ক্লান্তস্বর শোনা গেল সুষমার। যেন নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন।

—অথচ ওদের দুজনেরই তো স্বপ্ন ছিল অন্যের সুখ। জীবনের অটুট স্বস্তি।

—হ্যাঁ। নিজেদের জীবনের বিনিময়ে ওরা দুজনেই গরিবের মঙ্গল চেয়েছিল।

—শ্রমিক-কৃষকের দুঃখের কথা, শোষণের কথা বলতে-বলতে চোখে জল আসত তপুর।—আর, শোধনবাদের কথা বলতে বলতে ঘৃণায়, ক্রোধে চোখে আগুন জ্বলত খোকনের। অথচ একই ক্রোধ, একই দুঃখ তো মানুষকে কাছে টানে বউদি। তবু কেন ওরা আজ পরস্পরের এমন নিষ্ঠুর শত্রু?

করুণ কণ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণ করলেন বউদি, জানি না, আমরা সাধারণ মানুষ, জটিল রাজনীতি বুঝি না ঠাকুরঝি। কিন্তু আমাদের, গরিবদের যারা মঙ্গল চায় তারা সবাই বেঁচে থাকুক, রাজনীতির কাছ থেকে সেটুকুও কি আমরা চাইতে পারি না?

এ প্রশ্ন সুষমারও। কিন্তু উত্তর দেবার আগে কাউকে হাতের কাছে খুঁজে পান না। পেলেও তাদের ভাষা বোঝেন না।

একই আলোর রেখায় পা রেখে নিঃশব্দে তাই এগিয়ে চলেন আবার দুজনে।

হঠাৎ দূরে একসময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

দুজনেই সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লণ্ঠনের শিখাটা একটু কমিয়ে দিলেন সুষমা। কাদের গাড়ি কে জানে? পুলিশেরও হতে পারে! সামনে মাটির একটা ঢিপি থাকায় এত দূর থেকে অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

আচমকা কয়েকটা উপর্যুপরি বোমার শব্দে হতচকিত হয়ে পড়েন সুষমারা। গাড়িটার দিক থেকেই শব্দটা আসছে যেন। আবার কী নতুন করে শুরু হলো হাঙ্গামা।

বউদি ফিস-ফিস করে বললেন, ঠাকুরঝি, শিগগির চলে যাও। এখানে আর থাকা উচিত নয়।

সুষমা চাপা আতঙ্কের সঙ্গে বললেন, আর তুমি?

—আমিও অন্ধকারের আড়াল দিয়ে চলে যাচ্ছি।

—না না, তা হয় না। তোমাদের দিক থেকেই শব্দগুলো আসছে মনে হয়।—সুষমার স্বরে ভয়।

বউদি যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, এবার পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ ভেসে এল ওদিক থেকে।

বোমার শব্দে গুলির শব্দে চিৎকারে মুহূর্তে আবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল চারদিক।

সুষমা শক্ত করে হাত চেপে ধরলেন বউদির। চাপা কাঁপা গলায় বললেন, বউদি, ওদিকে যেতে পারবে না এখন। আমার সঙ্গে এস।

—কোনদিক আর নিরাপদ নেই ঠাকুরঝি, কোনদিকে যাবে তুমি ?—হতাশ হাহাকারের মত শোনায় বউদির স্বর।

ক্ষীণ লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার কাঁপিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করেন দুজনে।

পেছনে বিস্ফোরণের শব্দ। চিৎকার। একরাশ ভারি পায়ের শব্দ যেন এদিকেই ছুটে আসছে।

শাড়িতে পা জড়িয়ে আসছে। চারদিকে নিঃসীম নীরন্ধ্র অন্ধকার। কোন এক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার গুহার ভেতর দিয়ে যেন আলোর সন্ধানে ছুটে চলেছে দুটি তাড়িত মানব।

পায়ের শব্দগুলো যেন আরো কাছে এসে পড়েছে। চিৎকার করে কী যেন বলছে ওরা।

মাটির ঢিপিটার কাছে এসে একটা মৃতদেহে হোঁচট খেয়ে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন সুষমা।

বউদি হাত টেনে ধরেন। তারপর আবার ছুটতে শুরু করেন দুজনে। কার মৃতদেহ পায়ে ঠেলে এলেন, তপু না খোকনের, দেখবার সময় নেই। স্তিমিত, অস্থির।

আচমকা একটা গুলি এসে লণ্ঠনটাকে প্রচণ্ড শব্দে চুরমার করে দিল। দপ্ করে নিবে গেল একমাত্র আলোর শিখাটা। আর মুহূর্তে বিশ্বগ্রাসী নীরন্ধ্র অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেল নিষ্প্রাণ এই বধ্যভূমির এতক্ষণের একমাত্র সঞ্চরণশীল ছায়া দুটি।

আর সেই সীমাহীন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এতক্ষণে, এই প্রথম, অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন সুষমা, এই অন্ধকার সমুদ্রে উজ্জ্বল একটা আলোর দ্বীপের মতো একমাত্র আলোকিত ওদের কলোনীর সেই শিল্পপতির প্রাসাদটি। নিরাপদ উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ও বাড়ির নিরুদ্বেগ কৌতূহলগুলো একটু ঝুঁকে ঝিলটার অন্ধকার সন্ত্রাসকে নিরীক্ষণ করছে।

যেখানেই হোক

চিত্ত ঘোষাল

হাঁটু দুটো সম্পূর্ণ সোজা হচ্ছিল না তার, শিথিল নগ্ন পা থেকে কোনো শব্দ উঠছিল না। প্রহরীদের ক্ষিপ্র কঠিন পদশব্দ সমতালে বেজে যাচ্ছিল শুধু—ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।

হঠাৎ পুরু মখমলের মতো কার্পেট-মোড়া, লুকনো নরম আলোয় স্নিগ্ধ বিশাল একটি ঘর শব্দগুলিকে নিঃশেষে শুষে নিল।

কুয়াশায় আবৃত আছন্ন ছিল তার চেতনা। তবু কঠিন আয়াসে আড়ষ্ট অবশ ঘাড ঘুরিয়ে সে পেছনে তাকাল। প্রহরীরা ভোজবাজির মতো অনুপস্থিত। মেহগনি রঙের বিরাট বন্ধ দরজা। পরিচর্যায় সোনার মতো উজ্জ্বল দরজার হাতল।

সমস্ত শরীরে ছড়ানো জমাট-বাঁধা ব্যথার কেন্দ্রগুলি এখন অসাড। একটা বিশেষ দোমড়ানো ভঙ্গিতে ভাস্কর্যের মতো স্থির থাকা সম্ভব হলে বেদনার ঐ কেন্দ্রগুলির অস্তিত্ব সে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু ভঙ্গির কিছুমাত্র বদল হলেই থ্যাতলানো মাংসপেশী স্নায়ু শিরা এবং সম্ভবত চিড়-খাওয়া হাড় থেকে বিস্ফোরিত যন্ত্রণার ঢেউ উঠে আসতে থাকে।

পেছন থেকে আবার সামনে তাকানোর চেষ্টায় তার ভঙ্গির কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকবে, তার স্বরযন্ত্র আপ্রাণ চেষ্টায় একটা আর্তনাদকে রুখে দিতে গিয়ে শ্লৈষ্মিকঝিল্লির সঙ্গে জড়ানো অদ্ভুত চাপা শব্দ তুলল, শরীর ঝুঁকে পড়ল সামনের অর্ধচন্দ্রাকার টেবিলের ওপর।

—বসুন। টেবিলের অন্যদিক থেকে শান্ত মৃদু স্বর ভেসে এল।

টেবিলের ওপর নোয়ানো ঢাকা ল্যাম্পের আলোকবৃত্ত থেকে দূরে, যেখান থেকে শব্দটা এল, যেন অরণ্যের মতো ছায়াচ্ছন্ন মনে হল তার। সেখানে অস্পষ্ট একটা মানুষের উপস্থিতি। সে ক্লান্ত চোখের তারার প্রসার সংকুচিত করে দৃষ্টির স্পষ্টতা আনতে চাইল।

—বসুন।

সে তার শরীরটাকে পাশের গদিমোড়া চেয়ারে ছেড়ে দিল।

ছায়াময় মানুষটি নিঃশব্দে এসে বসল টেবিলের ওদিকে, তার মুখোমুখি।

এবার তার ক্ষীণ দৃষ্টি মানুষটির কিছু আন্দাজ পেল। খাকি ইউনিফর্ম। চতুষ্কোণ ভারি মুখ। ছাঁটা গোঁপ। স্বল্প আলোয় আর কিছু তার চোখে স্পষ্ট নয়। লোকটির কাঁধ যেন ঘরের দেয়াল থেকে দেয়াল ছুঁয়ে আছে।

—আপনাকে কি ওরা খুব কষ্ট দিয়েছে?

সে তার দোমড়ানো ভাস্কর্যের ভঙ্গিতে নিথর, নিরুত্তর।

—কফি খাবেন?

—না।

—খাবার?

—না।

—খান, খান।

কারা যেন এসে অর্ধেক টেবিল জুড়ে খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল।

চৌকো-মুখ লোকটির হাতে কফির পেয়ালা। শব্দহীন অভ্যাসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে।

পেয়ালা নামিয়ে রাখার ক্ষীণাতিক্ষীণ শব্দ।

—কই, খান, হাত লাগান।

—আমার পক্ষে এখন খাওয়া সম্ভব নয়। তার মৃদু অথচ দৃঢ় উচ্চারণে সে নিজেই বিস্মিত হল।

—আপনাকে আমাদের কাছে বহুদিন থাকতে হতে পারে। না-খেয়ে পারবেন?

বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে যেন কঠিন ইস্পাতের মোড়কে মুড়ে নিয়ে এক আশ্চর্য মনোময় অস্তিত্বের মধ্যে, সমুদ্রের নিঃশব্দ নীল গভীরে ডুবুরীর নেমে যাওয়ার মতো, সে নিজের ভেতরে গুটিয়ে যেতে লাগল। এই কৌশলটা সে সম্প্রতি রপ্ত করেছে, এটা তার আত্মরক্ষার কাজে লাগছে।

—খান, খান বলছি, দিস ইজ অ্যান অর্ডার।

টেপ রেকর্ডারে-ধরা বাঘের গর্জন খুব নিচু পর্দায় বাজালে যেমন শোনায়, শব্দগুলো তেমনি শোনাল তার কানে।…সে নীরন্ধ্র অরণ্যের ঠাণ্ডা ভেজা অন্ধকার আরামের দিকে চলে যেতে লাগল…

—আপনি কবি, আপনাকে এভাবে আটকে রাখা আমাদের ইচ্ছে নয়। দেশকে আপনার অনেক দেবার আছে। শুধু, লোকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে

বলে দিন, আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। জানেন লোকটা আমাদের, মানে, দেশের কত বড় শত্রু।

সে অরণ্যের নির্জনে—গভীরতম নির্জনতার আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে···অনেক দূরে কোথায় যেন ক্রুদ্ধ শব্দের রাশি একঝাঁক ভিমরুলের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে···

—আপনি জীবনকে ভালোবাসেন না? এ প্রশ্নটি পত্র-লতার নিবিড় আচ্ছাদন ভেদ করে তার কানে পৌঁছল।

—বাসি। তার উচ্চারণে কোনো জড়তা নেই।

—তাহলে আপনি বাঁচবার চেষ্টা করছেন না কেন?

—জীবনকে ভালোবাসার অর্থ কি যে-কোনো মূল্যে বেঁচে-থাকা?

—শয়তান!

সহসা শত সূর্যের দীপ্তি যেন কঠিন বস্তুপুঞ্জের মতো ভেঙে পড়ল তার ওপর। মুহূর্তেক সে চেষ্টা করল চোখ মেলে তাকাতে। কোথা থেকে চোখ-অন্ধ-করা আলোর প্রবল বিচ্ছুরণ তাকে ঢেকে ফেলেছে। চোখ বুজল সে। তবু চোখের পাতা, অক্ষিগোলক ভেদ করে রেটিনায় পৌঁছে যাচ্ছে আলোর দাহ। কোন্ ছবির শুটিং চলেছে? কোন্ ছবির নায়ক সে? এত আলো সহ্য করতে পারে এমন নায়ক আছে কি! কথাগুলো মনে হতে তার ভেতরে হাসির একটা চোরাস্রোত খেলা করে গেল।

—তাকান, চোখ মেলে তাকান, তারপর আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করুন।

তৃতীয় মাত্রার প্রয়োগ চলেছে—মুহূর্ত ভাবল সে, তারপর প্রচণ্ড ঘৃণায় তার ছোট্ট সাবমেরিনে ঢুকে সমুদ্রের অতলে জল-চোয়ানো নরম নীল আলোর রাজ্যে নেমে গেল, ঘুরে বেড়াতে লাগল বিচিত্র মাছ প্রবাল ঝিনুক শঙ্খ জলজ উদ্ভিদের বর্ণময় জগতে···

—ইমপসিবল্! শুয়ারের বাচ্চাটাকে সাত নম্বরে নিয়ে যা। ওকে আমি কাদার তাল বানিয়ে ছাড়ব।

সে কারো অবলম্বন ছাড়াই ন্যুব্জ বক্র শরীরটাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। নিজের এই শারীরিক সক্ষমতায় সে ভীষণ গর্ববোধ করছিল।

—ব্যাটার তেজ দেখছিস! ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বাপধন, সাত নম্বরে থাকই না ক'দিন। পেছন থেকে প্রহরীর মন্তব্য।

সে চোখ মেলে সামনে তাকাল। বারান্দাটা যেন দীর্ঘ হতে হতে কোন

দূরান্তরে মিলিয়ে গেছে। দু'পাশে একই রকম বন্ধ দরজার সারি। এ রকম বারান্দা কি সে সিনেমার কোনো দৃশ্যে দেখেছিল? নাঃ, এরা তাকে নায়ক না বানিয়ে ছাড়বে না দেখা যাচ্ছে—সামনের প্রহরীকে অনুসরণ করতে করতে সে ভাবল ঈষৎ কৌতুকে।

কবজা, তালা, শেকলের শব্দ। সাত নম্বর। আড়ে-দীঘে দম-বন্ধ-করা ছোট্ট ঘরটা তাকে জাপটে ধরল।

কাঠের বাংকে শুয়ে সে ওপরের দিকে তাকাল। অসম্ভব উঁচু ঘরটার কোথাও জানালা নেই, ছাতের কাছাকাছি কয়েকটা ফোকর, সেগুলো দিয়ে কিছু আলো এসে পড়েছে সিলিং-এ। আলোর রঙ-ফেরা দেখে তার মনে হল এখন সকাল।

সে শুয়ে রইল। শুয়েই কাটাতে লাগল দিনরাতের অন্তহীন মুহূর্তগুলি। দিনের পর দিন। কারণ শুয়েই সিলিং-এ আলোর রঙ-ফেরা দেখে সে অনুভব কবত বাইরে জীবন আছে, সময় এগিয়ে চলেছে।

মানুষের মুখ, মুখের ভাষা—নিষিদ্ধ তার কাছে। ইচ্ছে করলে সে শুধু নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারে। তাকে দু'বার খাদ্য ও জল দেয়া হয়। দরজার একটি ক্ষুদ্র অংশ খুলে যায়, কোনো মানুষের উপস্থিতি বোঝা যায় না, শুধু খাদ্য ও জলের পাত্র দু'টি পৌছে যায় তার কাছে।

একটি পায়রা আলোর ফোকরগুলি দিয়ে মুখে খড়কুটো নিয়ে ঘুরে ঘুরে আসে তার ঘরে। ওড়াউড়ি করে, দু'একটি পালক ঝরে পড়ে, সে তুলে নেয় ভালোবাসার মতো। বাসা বানানোর অক্ষম চেষ্টা করে পায়রা, মুখের খড়কুটো পড়ে যায় বারবার। হাসি পায় তার, বলে—আয়, নেমে আয়! আমি তোর বাসা বানিয়ে দেব। তুই কি বাসা বানাতে পারিস!

ধূসব পায়রাটির বুকের কাছটা বাদামী।

হঠাৎ একদিন তার মনে হল সিলিং-এর আলো কম। লক্ষ্য করল কয়েকটি ফোকর বন্ধ। ওরা তাকে আলো থেকে জীবন থেকে একটু একটু করে সরিয়ে নিতে চাইছে, ভাবছে এমনি করেই কোটি জীবন থেকে নিজের একটি জীবনকে বেশি মূল্যবান ভাবতে তাকে বাধ্য করবে।

আলো আসার এখনো-খোলা ফোকরগুলি গুনে রাখল সে।

পরদিন ভোরের প্রথম আলোয় সে দেখল আরো কয়েকটি ফোকর বন্ধ। শেষ ফোকরটি যেদিন বন্ধ করে দেয়া হবে সেদিনের কথা সে ভাবল।

মনে মনে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ সে রাখল।

খাওয়া বন্ধ করে দিল সে। শুধু জল। খাবারগুলো সংলগ্ন শৌচাগারে ফেলে দিতে লাগল।

এখন আরো দীর্ঘ সময় সে শুয়ে থাকে।

পায়রাটা আসে। ডানার ঝাপটে কখনো গান, কখনো সমুদ্রের উল্লাস, কখনো বৃষ্টির রিমঝিম, কখনো লক্ষ মানুষের মিছিলের কল্লোল নিয়ে আসে।

সে নিবিড় ভালোবাসায় তাকায়। ভালোবাসা তার শীর্ণ দুর্বল শরীরের ভেতরে প্রতিজ্ঞার স্থির অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে থাকে। সে অনুভব করে মৃত্যুর মহিমা। একটি সফল মৃত্যু জীবনকে অনেক অনেক এগিয়ে নিয়ে যায়।

একদিন সে দেখল আর একটিমাত্র ফোকর অবশিষ্ট আছে। অপলক সেদিকে তাকিয়ে রইল। সে জানে কাল এটাও থাকবে না।

কি যেন আছড়ে পড়ল পাশে। চূর্ণ ক্ষীণ আলোয় সে দেখতে পেল না। উঠে হামাগুড়ি দিয়ে মেজেতে হাতড়াতে লাগল। নরম পালকে মোড়া মাংসপিণ্ড হাতে ঠেকল—এখনো উষ্ণ। তুলে নিল হাতে। উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখ তীক্ষ্ণ করে তাকাল। একটি পায়রা! গলায় শক্ত সুতোর ফাঁস। ধূসর পায়রাটির বুকের কাছটা বাদামী! হঠাৎ মাইক্রোফোনে বেজে উঠল তারই কণ্ঠস্বর···আয়, নেমে আয়। আমি তোর বাসা বানিয়ে দেব। তুই কি···। মুহূর্ত থমকে, দুর্বল ফুসফুস ফাটিয়ে, সাত নম্বর সেলের দেয়াল চৌচির করে হেসে উঠল সে! স্তব্ধ হয়ে গেল পরাজিত ধূর্ত মাইক্রোফোন!

*　　　*　　　*　　　*

তাকে কাদার তাল বানানোর চেষ্টার এই পর্যায়ের শেষ দিন সকালে যখন আলো আসার শেষ ফোকরটি বন্ধ করে দেয়া হল, তার আগেই সে চলে গিয়েছে মুক্ত সূর্যালোকে, ইতিহাসের পাতায়, চিরকালের মানুষের দলে!

পিপাসা

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

দ্রবময়ী গঙ্গা সেরে ফিরছিলেন।

তার মাথা ন্যাড়া, পরনে পরিষ্কার বকের পালকের মত শাদা থান, বাঁ হাতে ভিজে কাপড় আর গামছার রাশ, ডান হাতে ঝকঝকে করে মাজা পিতলের ঘটিতে গঙ্গা জল! সমানে বক বক করতে করতে তিনি পথ হাঁটছিলেন।

মেজাজটা খুবই খারাপ ছিল দ্রবময়ীর। গঙ্গার ঘাটে এক দঙ্গল বাউণ্ডুলে ছেলেমেয়ে সমানে জলের মধ্যে হুল্লোড় করছিল। তাদের হাতের পায়ের জলের ছিটে দ্রবময়ীকে উত্যক্ত করে মারছিল। যতবারই তিনি জল থেকে ভিজে কাপড়ে ঘাটের বাঁধান সিঁড়িতে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন ততবারই বদমাইশ ছেলে-মেয়েগুলো দাপাদাপি করে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল গায়ে। বারবারই এ রকম হচ্ছিল। আর ফিরে ফিরে দ্রবময়ীকে জলে নামতে হচ্ছিল নতুন করে পরিশুদ্ধ হবার জন্য। তিক্ত বিরক্ত দ্রবময়ী ওদের মা বাপ তুলে সমানে গাল পেড়েছেন। কিন্তু তাতে বড় বয়েই গেছে ওদের। ওরা খালি খিলখিল করে হেসেছে নিজেদের মধ্যে, আর বড় বড় মাছের মত জল তোলপাড় করে পাক খেয়েছে, কেউ কেউ ডুব সাঁতার কেটে এসে ঢুঁশ দিয়েছে পেটে, কেউ বা ঘাট থেকে ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাড়ের অগভীর জলকে ঘোলা আর ময়লা করে তুলেছে। ক্ষিপ্ত দ্রবময়ী তারস্বরে গাল দিয়েছেন,—'ওরে অলপ্পেয়ে হাড়হাভাতে পোড়ারমুখোরা। মাবাপ কি তোদের শিক্ষা দেয় না। নুড়ো জ্বেলে দিই তোদের বাপ মায়ের মুয়ে। যম কি তোদের ভুলে গেছে—'

ঘাটের অন্যান্য বয়স্ক স্নানার্থীরা ব্যাপারটা প্রথমে উপভোগ করেছে। গায়ে গতরে যথেষ্ট শক্ত ও কার্যক্ষম এই বৃদ্ধাকে সকলেই সমীহ করে শুধু তার মুখের ভয়ে। মুখরা ঝগড়াটে বলে খ্যাতি আছে দ্রবময়ীর। আর সে খ্যাতি কিছু অযথার্থ নয়। তার ঝগড়ার তোড়ের মুখে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন সাহস আর বুকের পাটা এ তল্লাটে কোন মানুষের নেই। বালখিল্যদের হাতে

দ্রবময়ীর ঐ হেনস্থায় স্নানরত অন্যান্য বয়স্ক মানুষরা বেশ খুশিই হচ্ছিল। কেউ কেউ আড়ালে চোখের ইশারায় প্ররোচনাও জুগিয়েছে। শেষে যখন ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করল তখন সেই সব বয়স্ক মানুষদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেই রেহাই পেলেন দ্রবময়ী।

এ তল্লাটে ছোট বড় সকলেই দ্রবময়ীকে দিদিমা বলে সম্বোধন করে। সকলেই চেনে দ্রবময়ীকে। কত বয়স হল তার কে জানে। বিধবা দ্রবময়ীকে সধবা দেখেছে এমন মানুষ ক্রমেই বিরল হয়ে উঠছে এ অঞ্চলে। পাড়ার প্রান্তে এক প্রকাণ্ড নির্জন পড়ো বাড়িতে তার নিঃসঙ্গ বাস। আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও আছে বলে কেউ জানে না। ঘুঁটে দিয়ে নকসী কাঁথা সেলাই করে, ঠোঙা তৈরি করে তার পেট চলে। তাই বলে কারো কাছে নীচু হবার পাত্রী নন দ্রবময়ী। এক কথার উত্তরে দশ কথা শুনিয়ে দিতে এতটুকু কশুর করেন না। একা একা আপন মনে সারাক্ষণই বক বক করেন। বিশ্ব সংসার আর এই সংসারের স্রষ্টা—উভয়ের বিরুদ্ধেই তার অন্তহীন অভিযোগ। উভয়ের মুখেই অহরহ ঝাড়ু মেরে মনে শান্তি পেয়ে থাকেন।

দ্রবময়ী গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছিলেন। আর ক্লান্তিহীন যতিহীন ভাবে তার মুখ চলছিল,—'ঐ ধাড়িগুলোই হল আসল বজ্জাত। ভাবে আমি কিছু বুঝতে পারিনে! চোখের মাথা কানের মাথা খেয়ে বসে আছি। আমি যেন বুঝিনি আড়াল থেকে ঐ পঙ্গপালকে লেলিয়ে দিচ্ছিল। নচ্ছার পাজীগুলোর ঘরে ঘরে মাগ আছে না—আমি বলছি তাদেরও এই আমার দশা হবে। দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষে করতে হবে। তেরাত্তির পোয়াবে না। যদি না হয় ত আমার নাম দেরবময়ীই নয়! তখন তোমরা দেরবময়ীর নামে কুকুর পুষো—হ্যাঁ—'

দোকানের ঝাঁপ প্রায় সবটা নামিয়ে দিয়ে একটুখানি ফাঁক করে নটবর বসে ঢুলে ঢুলে বিড়ি বাঁধছিল। বকবকানিতে তার মনোযোগ ক্ষুণ্ণ হল। তাকিয়ে দ্রবময়ীকে রাস্তায় দেখে হেঁকে উঠল নটবর,—'ও দিদিমা, ওদিক পানে যেয়ো নি। খুব গোলমাল বেধেছে—'

কথার মধ্যে বাধা পেয়ে দ্রবময়ী ঘুরে দাঁড়িয়ে নটবরকে দেখলেন। তার দু চোখে আগুন ছুটছিল। নটবরের কথায় কোনো বজ্জাতি আছে কি না সঠিক বুঝতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নটবরের গম্ভীর

উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে খানিকটা নিশ্চিত হলেন যে নটবর ইয়ারকি মারছে না। তখন তিনি বীরবিক্রমে বললেন,—'কিসের গোলমাল র‍্যা ?'

—'আর দিদিমা, কিসের গোলমাল সে খোঁজ কে রাখে। গোলমাল ত লেগেই আছে। খুব বোম-বাজি হল কিছু আগে, তারপর চাকু চালাচালি। মোড়ের ওপর নাকি লাশ পড়ে আছে একটা। পুলিশ এসেছে দু ভ্যান ভর্তি, হাতের কাছে যাকে পাচ্ছে তাকেই তুলছে—। ওদিক পানে এখন যেয়োনি দিদিমা, তোমাকেও রেয়াৎ করবে না—'নটবর গম্ভীর মুখে আবার বিড়ি বাঁধায় মন দিল।

নটবরের উক্তিতে দ্রবময়ীর অহংকারে আঘাত লাগল। কোনো কীট পতঙ্গ দেখার দৃষ্টিতে নটবরকে দেখলেন তিনি। তারপর সদর্পে বললেন,—'দেরবময়ীকে ধরবে তেমন পুলিশ এখনও মায়েব গব্বে। পুলিশ এয়েছে ত হয়েছেটা কি! পুলিশের ভয়ে কি এই গঙ্গাচ্চান করে এসে ঘুরপথে আস্তাকুঁড় মাড়িয়ে বাড়ি ফিরব! তেমন বাঁদী দেরবময়ী নয়—'

বকবক করতেই দ্রবময়ী এগোলেন,—'আমায় কিনা পুলিশ দেখাচ্ছে। বলে কত পুলিশ দেখনু জেবনে। বোচনের বিয়ে হয়েছিল পুলিশের এক বড় কত্তার সঙ্গে। সবাই ত ভয়েই তটস্থ। এই দেরবময়ী গিয়ে সেই পুলিশের কানটা এমন মলে দিল যে কান ছাড়িয়ে নিয়ে পালানর পথ পায়নি বাছাধন। সব্বাই বললে, হ্যাঁ দিদিমা তোমার সাহস আছে বটে। আমি বলনু, সাহসের আর দেখলি কি, ঐ পুলিশের বাপকে নিয়ে আয় না, তার কানটাও মুলে দিই কো তরিবৎ করে—'

আপন মনে বকতে বকতে দ্রবময়ী পথ হাঁটছিলেন। পুরনো কথার টানে পুরনো দিনগুলো তার মনে ফিরে আসছিল। বোচন হল দ্রবময়ীর ভাইঝির মেয়ে। সে এখন বয়স্কা বিধবা, কাশীবাসী। সেই বোচনের বিয়ে—সে আজ কতদিন হয়ে গেল—

স্মৃতি রোমন্থনের দরুণ অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিলেন দ্রবময়ী। বাইরের দিকে চোখ ছিল বটে, বিশেষভাবে লক্ষ্য করে কিছু দেখছিলেন না। নইলে দেখতে পেতেন যতই এগোচ্ছেন রাস্তা ক্রমেই জনবিরল হয়ে উঠছে, দুপাশের দোকানপাটের ঝাঁপ নামান, বাড়ি ঘরের দরজা এঁটে বন্ধ করা। সকালে এই সময় এমনটা হবার কথা নয়। এখন রাস্তাঘাট লোকজনে গম গম করে, দোকানে দোকানে বিকিকিনি চলে, দু দিক দিয়ে হাজারো মানুষ যাতায়াত করে।

চৌরাস্তার মোড় বরাবর এসে পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন দ্রবময়ী। আশ্চর্য চোখ নিয়ে তিনি চারপাশে তাকাতে লাগলেন। নটবরের কথাটা মনে পড়ল। কি নাকি গোলমাল হয়ে গেছে এখানে একটু আগে—

গোলমালের চরিত্রটা বোঝার জন্য দ্রবময়ী নজর তীক্ষ্ণ করে মোড়েব দিকে তাকালেন। দুটো পুলিশের গাড়ি দেখতে পেলেন। গোটা কয় পুলিশ টহল মেরে বেড়াচ্ছে। হাতে বন্দুক। আর কিছু নয়—

না, আরো কিছু ছিল। ঠিক রাস্তার মাঝখানে একটা মানুষ শুয়ে রয়েছে কাত হয়ে। ঠিক শুয়েও নেই। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওভাবে শোয় না। হাত পায়ের অবস্থান প্রথামত নয়। দুটো পা পরস্পরেব সঙ্গে একটা প্রায় অসম্ভব কোণ সৃষ্টি করেছে, বাঁ হাতটা যেভাবে বেঁকে সমস্ত শরীরের তলায় চাপা পড়ে গেছে তাতে মনে হয় মানুষটা যেন দৈবাৎই পড়ে গেছে রাস্তায়, পড়বার আগে নিজেকে সামলে নিতে সহজাত বৃত্তিগুলোকেও কাজে লাগানর অবকাশ পায়নি।

মানুষটাকে ঘিরে এক গঙ্গা রক্ত। সহস্র ধাবায় সেই রক্ত গড়িয়ে চলে গেছে, নানা দিকে গড়ানো রাস্তার গা বেয়ে বেয়ে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা বহুপদ লোহিতবর্ণ প্রাণী তার হাজারটা পা দিয়ে মাটি কামড়ে ধবে রয়েছে অন্তিম মৃত্যু পদক্ষেপে।

দ্রবময়ীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁং করে উঠল। নটবর বলেছিল বটে একটা লাশ পড়ে আছে মোড়ের উপর। আহারে! কে জানে কে মরল। কার ছেলে বা কার স্বামী। কি যে হল দেশটার! খালি মারামারি আর কাটাকাটি। আর অল্প স্বল্প কিছু নয়। একেবারে জীবনের মত শেষ। যে যাকে পারছে শেষ করে দিচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায়। লোকমুখে শুনতে পান দ্রবময়ী রোজই নাকি এমন দশ বিশটা মরছে। এ অঞ্চলেও যে এর আগে কেউ মরেনি এভাবে এমন নয়। তবে এতদিন শুধু তিনি শুনে শুনে এসেছেন, এমন সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করেন নি কোনদিন এর আগে—

মোড়টা পেরিয়ে যেতে হবে দ্রবময়ীকে। একটু থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার চলতে শুরু করলেন। মুখে বকবকানির কামাই ছিল না,—'মার ঝাড়ু, ঝাড়ু মার এমন স্বাধীনতার মুয়ে। কাটাকাটি করে সব শেষ হয়ে গেল আর ভোগ করবে কে স্বাধীনতা। তখন সব একেবারে হেঁদিয়ে উঠে

সায়েবগুলোকে খেদালে, এখন কোনো কিছুই সামলাতে পারছে না নিজেরা। সব চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে—'

জনমানবশূন্য চৌরাস্তায় শুধু কয়েকজন পুলিশ প্রহরী আর দ্রবময়ী। দ্রবময়ীর দুর্জয় সাহসে বোধহয় পুলিশ কজন অবাক হয়ে গিয়েছিল। মুখে কথা জোগায় নি! ততক্ষণে দ্রবময়ী অনেকটা এগিয়ে এসেছেন! এখন সম্বিত ফিরে পেয়ে একজন প্রহরী হেঁকে উঠল,—'এ-ই বুড়িয়া। তুম কিধর যাতি হ্যায় ?—'

দ্রবময়ী ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তা পুলিশটির দিকে তাকালেন। তামাটে ফোলা ফোলা মুখ। জমকালো চোমড়ানো গোঁফ দু ভাগ হয়ে দুদিকে উঠে গেছে কান পর্যন্ত। কান থেকে অনেকখানি উপরে তুলে ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, চোখের শাদা জমিতে লাল ছিটে। দ্রবময়ীর হাবে ভাবে যুদ্ধং দেহি ভাব ফুটে উঠল,—'কেন রে আঁটকুড়োর ব্যাটা, তোকে সে কৈফত দেব কেন ?'

সম্বোধনের অর্থটা বুঝতে পারল না পুলিশ। কিন্তু দ্রবময়ীর চোখের রক্তিমাভা আর বাজখাই কণ্ঠস্বর থেকে সে অন্তত বুঝল যে সেটা খুব প্রীতিপূর্ণ নয়। সেও সমান তেজের সঙ্গে তার বন্দুকের কুঁদো দুবার মাটিতে ঠুকে বলল,—'হঠ যাও, হঠ যাও ইধরসে। ভাগ যাও—'

নেহাৎ দ্রবময়ীর দুহাত জোড়া বলেই তিনি কোমরে আঁচল জড়াতে পারলেন না। কিন্তু তার চোখ মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল সম্মুখযুদ্ধ থেকে হার মেনে পিছু হটার পাত্রী তিনি নন। দ্রবময়ী কাংস্য কণ্ঠে চাপান দিলেন,—'কেন র‍্যা ? কেন র‍্যা নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি ? এটা কি তোর চোদ্দ পুরুষের বাপের জমিদারী যে হট যাও বললেই হটে যাব। ওসব চোখ রাঙানি দেম্ববময়ীকে দেখাতে এস নি। দেরবময়ী কারো শাসানিকে ভয় পায় না। মুল্লুকমে তোমার জরু হায় না, চোখ গরম তাকে করগে যা ব্যাটা, সে ভয় খায়গা—'

মুল্লুকস্থিত জরুর উল্লেখে পুলিশটি বড়ই অপমানিত বোধ করল। তার চোখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তার অন্যান্য সঙ্গীরা হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠায় ভীষণ অপ্রস্তুত বনে গেল সে। উত্তেজনা দমনের জন্য সে বাঁহাতে গোঁফের পরিচর্যা করতে করতে বলল,—'হাসতে কিঁউ ? হাসতে কিঁউ তুমলোগ ? হাসনে কা বাত কেয়া হুয়া ?'

এবার অপর একটি পুলিশ এগিয়ে চল। সমঝোতার স্বরে দ্রবময়ীকে বলল,—'আরে বুড়ি মাই—। আপ কাহে ইধর আয়ি? বহুৎ বোম গিরা, ফিন শুরু হো যায়গা আভি। উধর দেখিয়ে চাকুসে আদমি খুন হো গিয়া। আপ জানানা হায় না। ইতনা ঝামেলা মে আপকো ত আনা ঠিক নহি—'

শান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে দ্রবময়ী বললেন,—'দেখ জমাদার সাহেব, আমাকে আর ঠিক বেঠিক শেখাতে এসনি। এই চার কুড়ি বয়স হতে চলল আমার। আমার লেড়কা বেঁচে থাকলে এতদিনে তোমাদের চেয়ে বড় হত। তোমরাও আমার লেড়কার মত—'

স্বজন স্বদেশ থেকে দূরে প্রবাসী পুলিশটি দ্রবময়ীর কথায় খুশি হয়ে উঠল। তবু একটু খুঁতখুতুনির সঙ্গে সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলল—'ইত ঠিকই বাত হায় মাইজী লেকিন—'

ততক্ষণে দ্রবময়ী পুলিশের নির্দেশমত রাস্তায় পড়ে-থাকা মানুষটার দিকে তাকিয়েছেন। মানুষটার গোটা শরীরটা কাত হয়ে গেছে বটে, মুখটা কিন্তু একটা অস্বাভাবিক মোচড় পেয়ে চিত হয়ে আছে আকাশমুখো। ফলে মুখটা ভাল করে দেখতে পেলেন দ্রবময়ী। আর দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মানুষ কোথায়। এ যে নেহাৎ কচি ছেলে। কত আর বয়স হবে। সতের আঠার খুব জোর। গোঁফের রেখা থেকে এখনও নীল ভাবটুকু সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। একেই দ্রবময়ী এতক্ষণ একটা দশাসই মানুষ ভেবে ভুল করেছিলেন।

—'আহা রে! কোন মায়ের কোল আলো করা মানিক এমন ধুলোয় লুটোয় রে!' বলে দ্রবময়ী পড়ে-থাকা ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

—'আরে এই বুড়ি মা-ই—'সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত ভাবে হেঁকে উঠল পুলিশরা সমস্বরে,—'আপকা উধর মৎ যানা। শুনতি নহি কিঁউ আপ—'

ধমকধামকে কর্ণপাত করলেন না দ্রবময়ী। গুটি গুটি এগিয়ে গেলেন যেমন যাচ্ছিলেন। কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তিনি ছেলেটিকে দেখতে লাগলেন। জন দুই পুলিশ তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দ্রবময়ীর দুপাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। একজন অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,—'দেখিয়ে বুড়ি মাই—। আপ কেয়া ঝামেলা পাকাতি। বাত শুনতি নহি আপ। অফসর লোক আ যায়েগা ত বহুত গুসা করেগা—'

মনোযোগে বাধা পেয়ে রেগে গেলেন দ্রবময়ী,—'আ মল যা। এত ভ্যাজর

ভ্যাজর করে জ্বালিয়ে মারলে বাপু। তোমরা ভেবেছ কি অ্যাঁ? একটা ছেলে মরে পড়ে আছে—ভাল করে দেখব না কাদের বাড়ির ছেলে, কি বিত্তান্ত—'

বলতে বলতে দ্রবময়ী লক্ষ্য করলেন, যে ছেলেটিকে তিনি মৃত ভেবেছিলেন, আসলে সে মরেনি এখনও। ধীরে বিলম্বিত লয়ে শ্বাস প্রশ্বাস বইছে ছেলেটির। খুব ক্ষীণ ভাবে তার বুক উঠছে নামছে। দেখেই সব কিছু ভুলে গেলেন দ্রবময়ী। ব্যগ্র উৎকন্ঠিত ভাবে একজন পুলিশের দিকে ফিরে বললেন,—'এ যে মরেনি জমাদার সাহেব। বেঁচে আছে এখনও'—সাগ্রহে পুলিশের বাহু চেপে ধরলেন দ্রবময়ী,—'ও জমাদার সায়েব, ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠানর ব্যবস্থা কর না, শিগগির। দেখছনা ধড়ে প্রাণটা রয়েছে এখনও। ও জমাদার সায়েব। এখুনি ব্যবস্থা কর—'

উদ্দিষ্ট পুলিশটি বিপন্ন দৃষ্টিতে তার সঙ্গীসাথীদের দিকে তাকাল। তারপর মরিয়ার মত বলল,—'আপ কেয়া বাতাতে মাইজী! ও কাম হামসে নেহি হোগা। অফসর লোক আ কর মেরা নোকরী খা লেগা—'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত ছুঁড়লেন দ্রবময়ী,—'কি খালি অফসর অফস করতা হায়। ধোলাও তোমার অফসরকে। তুমকো অফসরের ধুধ্ধুি নেড়ে নেই দেগা। ত আমার নাম দেরবময়ীই নয়। কোথায় গেছে গুখেকোর বেটা—'

চালু বিশেষণগুলো বোধগম্য হল না পুলিশের। সে ক্যালফ্যাল কে তাকিয়ে রইল দ্রবময়ীর মুখের দিকে। তারপর আন্দাজে প্রশ্নটা বুঝে বলল,—'অফসর লোক গিয়া হায় ইনকুয়েরি মে। আভি আ যায়গা আপ অভি হট যাইয়ে ইধরসে, হট যাইয়ে—'দুজন পুলিশ তাদের রাইফে আড়াআড়ি করে দ্রবময়ীকে মৃদু ভাবে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল।

—'আরে এ উনুনমুখোগুলো ঠেলাঠেলি করে কেন র‍্যা—' দ্রবময়ী হাতে তাড়নায় আড়াআড়ি রাইফেল দুটোকে সরিয়ে দিলেন সামনে থেকে তারপর সেই ধুলোবালি আকীর্ণ রাস্তায় ঝপ করে বসে পড়লেন পড়ে-থাক ছেলেটির পাশে। গঙ্গাজলের ঘটি আর স্তূপীকৃত ভিজে কাপড় চোপ রাস্তাতেই নামিয়ে রাখলেন। তারপর সযত্ন সাবধানে মুমূর্ষু ছেলেটি মাথাটি তুলে নিলেন নিজের কোলে।

পুলিশরা সমস্বরে হাঁ হাঁ করে উঠল।

দ্রবময়ী ধমকে উঠলেন,—'চুপ করে থাক বেটারা। কানাকড়ির মুরোদ নেই—কুলোপানা চক্কর।—'

ছেলেটির মাথা কোলে নিয়ে দ্রবময়ী চারপাশে কাছে দূরে তাকাতে লাগলেন। চারপাশে বাড়ির বারান্দায় জানলায় কিছু কিছু মানুষ দেখা দিয়েছে ততক্ষণে। চৌরাস্তার মোড়ে যে কাণ্ডটা চলছে তাই দেখবার জন্য কতগুলো মানুষের কৌতূহলী উৎসুক মুখ সতক চোখ জড়ো হয়েছে এখানে সেখানে বারান্দায় জানলায় গলির মোড়ে মোড়ে। দ্রবময়ীকে সকলে চেনে, সকলে সমীহ করে। কিন্তু তবু তার এই দুর্জয় সাহসের সঙ্গে কারো পরিচয় ছিল না। এখনই পুলিশরা মারধর শুরু করতে পারে, ছেলেটির বিপরীত পক্ষ—যারা তাকে হত্যাই করতে চেয়েছে—বোমা ছুঁড়তে শুরু করতে পারে। অথচ বলিহারী সাহস বুড়ির, কোনো কিছুকে পরোয়া না করেই কেমন পুলিশের সঙ্গে যুঝে একেবারে সিংহের গুহায় আসন পেতে বসেছে।

দ্রবময়ী দূরে দূরে দৃশ্যমান মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লেন বাজখাই গলায়—'বলি ও ভদ্দরনোকের ছেলেরা, ও ছেলেপুলের বাপেরা, ও এয়োতি পোয়াতির সোয়ামীরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে মজা না দেখে একটু এগিয়ে এস না। এই ছেলেটাকে একটু হাসপাতালে পাঠানর বন্দোবস্ত কর। এখনও প্রাণটা ধুকপুক্ করছে বুকের মধ্যে। রাস্তায় পড়ে পড়ে বিনে চিকিচ্ছেয় মরে যাবে নাকি বেচারা—'

দ্রবময়ীর উচ্চ কণ্ঠস্বর বাতাসে ভর করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যারা দ্রবময়ীর কার্যকলাপ দেখবার জন্য দূরে দূরে জমায়েত হয়েছিল, এখন সহসা দ্রবময়ীর এই আহ্বানে বিপন্ন বোধ করল। ডাকলে কি অমনি সাড়া দেওয়া যায় নাকি! যাওয়া যায় নাকি ওখানে! ওখানে পুলিশ আছে, পুলিশের হাতে রাইফেল আছে, রাইফেলে গুলি ভরা আছে, প্রয়োজনবোধে গুলি চালানর খোলাখুলি নির্দেশ দেওয়া আছে, আড়ালে আবডালে মারমুখো ছেলেরা হাতবোমা নিয়ে ঘাপটি মেরে আছে—ওখানে গিয়ে কে যেচে বিপদকে বরণ করে নেবে। তার চেয়ে নিরাপদে পিছিয়ে যাওয়াই ভাল।

দূরে দূরে জমায়েত মানুষগুলোর মধ্যে পিছনোর জন্য হুড়োহুড়ি লেগে গেল। জানলা থেকে মুখগুলো কাগজের ছবির মত হাওয়ায় উড়ে গেল।

বারান্দায় দাঁড়ান মানুষগুলো হঠাৎ উবু হয়ে বসে পড়ে বারান্দার জাফরি আড়ালে আত্মগোপন করল, আর গলির মোড়ে মোড়ে মানুষগুলো একজন আর একজনের আড়ালে যাওয়ার প্রচেষ্টায় সবাই মিলেই প্রায় গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে বসে অবাক চোখে বয়স্ক মানুষগুলোর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করলেন দ্রবময়ী। তারপর তাঁর ভাঙা কাঁসরের মত কণ্ঠস্বর খন খন করে বেজে উঠল,—'এ কি র‍্যা। এ কি। এগুলো সব মানুষ না আর কিছু। নাকি ভেড়ার পাল। সব পালিয়ে গেল। একটা ছেলে মরে যাচ্ছে আর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে কেউ একটু এগিয়ে পর্যন্ত এল না। এই কি মানুষের মত ব্যাভার—' দ্রবময়ী পাহারারত পুলিশদের দিকে তাকালেন করুণ চোখে। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন,—'ও বাবারা, তোমরা একটা কিছু ব্যবস্থা কর। এ যাতে মরে যায় তাই দেখবার জন্যই কি তোমরা আছ এখানে—'

ততক্ষণ পুলিশদের দৃষ্টি ঘুরে গেছে অন্যদিকে। সে দিক থেকে মস্‌মস্ করে এক সঙ্গে অনেক জোড়া জুতোর শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে এদিকে। দ্রবময়ী ঘাড় ঘুরিয়ে পুলিশদের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন চার পাঁচজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার প্রায় মার্চ করার ভঙ্গিতে দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাদের চোখে মুখে উত্তোলিত ভ্রূতে গভীর বিস্ময়।

পুলিশ অফিসাররা কাছে চলে এল। একজন অফিসার পাহারাদার পুলিশের দিকে তাকিয়ে দ্রবময়ীকে দেখিয়ে কঠোর স্বরে বলল,—'ই কেয়া ?'

একজন পুলিশ কৈফিয়তের সুরে বলল,—'বাত মানতি নেহি মাইজী। আ গেয়ি আউর বৈঠ গেয়ি উধর—'

পুলিশ অফিসারের কণ্ঠস্বর কঠোরতর হল,—'হুঁ। আ গেয়ি আউর বৈঠ গেয়ি। তুম ইধর থা কিঁউ ?—'অফিসার দ্রবময়ীর কাছে এগিয়ে এল। উপর থেকে উপবিষ্ট দ্রবময়ীর দিকে তাকিয়ে তর্জনী সংকেতে নির্দেশ দিয়ে কঠিন কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলায় বলল,—'এই যে ! আপনি উঠুন। উঠে পড়ুন—'

দ্রবময়ী চোখ তুলে পুলিশ অফিসারের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন গাড়িবারান্দাওলা টুপির নিচে অফিসারের দৃষ্টি খর। লালচে মুখ রাগে থমথম করছে। কিন্তু রাগ দেখে ভয় পাওয়ার পাত্রী দ্রবময়ী নন। তিনিও সমান তেজের সঙ্গে বললেন,—'কেন ? উঠব কেন ?'

—'এটা বসে থাকার জায়গা নয়।'

দ্রবময়ী বললেন,—'তাত নয়ই। আগে ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর। গিয়ে হাসপাতালে বসে থাকব—'

পুলিশ অফিসার আরো রেগে গেল। দ্রবময়ীর 'তুমি' সম্বোধন তার সম্মানবোধকে ক্ষুন্ন করেছে,—'হাসপাতালে পাঠাব কি মর্গে পাঠাব সে আমরা বুঝব। এখন আপনি উঠুন। চলে যান এখান থেকে—'

দ্রবময়ী কয়েক পলক দেখলেন অফিসারকে। তারপর স্বরটিকে একটু টেনে রেখে বললেন,—'ই—স্। উঠব। চলে যাব। উঠব কেন? কেন চলে যাব? তোমার হুকুমেই? এটা কি তোমার রাজত্বি নাকি? ছেলেটা এখানে পড়ে থাকবে, আর আমি তোমার কথাতেই চলে যাব ওকে ছেড়ে! বলি তুমি পেয়েছ কি? অ্যাঁ? মগের মুলুক নাকি?—'

পুলিশ অফিসার কি বুঝল কে জানে। চট করে সে আর কোনো কথা বলল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত সহকারে সে বলল,—'ও কি আপনারই ছেলে?'

দ্রবময়ী চোখ তুলে পুলিশ অফিসারের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর জোর দিয়ে বললেন,—'হ্যাঁ। আমার ছেলে। আমারই। মেলা বকবক করনা বাপু—'

—'আপনার ছেলে ত সামলে রাখতে পারেন নি ছেলেকে! এই সব গুণ্ডামি বদমাইশি না করলে এমন অকালে মরত না—'

দ্রবময়ীর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছুটল,—'সে কৈফত তোমাকে দেব না। তোমরা ভাত দেবার ভাতার নও, কিলোবার গোঁসাই। ছেলেটাকে হাসপাতালে পাঠানর ব্যবস্থা করতে পার না। ঐ সব ভাল ভাল বুলি কপচাতে এয়েছ যে বড়—'

সহসা দ্রবময়ীর কোলের মধ্যে আহত মুমূর্ষু ছেলেটার মাথাটা নড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তিনি কথা থামিয়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন সে চোখ খুলেছে। সারা মুখে তীব্র যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। ঘোলাটে দুটো চোখের মণি দুচোখের নিষ্প্রভ শাদা জমিতে অস্থির অনির্দিষ্ট ভাবে নড়ছে ঘুরছে, যেন তার চোখের সামনে অতি দ্রুত নেমে-আসা কালো পর্দাটা ভেদ করে সে কিছু দেখতে চায়, কিন্তু ক্রমেই তার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, ঝাপসা হয়ে আসছে, ঘন কালিমা ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই

সামনে। তখন ছেলেটার ঠোঁট দুটো ক্ষীণ ভাবে নড়ে উঠল। কি যেন বলছে। কিন্তু তার অস্পষ্ট অস্ফুট কণ্ঠস্বর কারো কানেই পৌছল না। তাড়াতাড়ি দ্রবময়ী মুখ নামিয়ে তার মুখের কাছে কান পেতে শুনলেন,—'জ—ল—'

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন দ্রবময়ী,—'জল! বাছা আমার জল খেতে চাইছে। জল কোথায় পাব এখানে এখন—' ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে দ্রবময়ী নিজের চারপাশে তাকালেন —'জল। একটু জল এনে দাও না কেউ আমার বাছার জন্য। একটু জল—'

ঠোঁট আবার কেঁপে উঠল ছেলেটার। তখন দ্রবময়ী পাশে বসা গঙ্গাজলের ঘটিটা হাতে তুলে নিলেন,—'এখানে আর জল কোথায় পাব কে এনে দেবে। নে বাবা, একটু গঙ্গাজলই খা। শেষ সময়টা গঙ্গাজল পড়ুক মুখে—'

দ্রবময়ী ঘটি কাত করে ক্ষীণ ধারায় গঙ্গাজল ঢেলে দিতে লাগলেন ছেলেটার মুখে,—'হরি বল, বাবা, হরি বল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল বাবা—'

ছেলেটার মুখে কিছু জল গেল, বেশিটাই গেল না। তারপর কশ বে সবটাই রাস্তায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে তার চোখের মণি দুটো চঞ্চলতা ঘুচে গেল। অবশেষে উর্দ্ধে উঠে গিয়ে স্থির অনড় হয়ে গেল দুটো ছররা গুলির মত। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ থেকে শুরু হয়ে একটা তী শিহরণ ক্রমেই উপর দিকে উঠে আসতে আসতে সেই শিহরণের অন্তি আক্ষেপেই যেন ছেলেটার মাথাটা দ্রবময়ীর কোলের মধ্যেই ঢলে পড়ল।

দ্রবময়ী বুঝলেন ছেলেটা মরে গেল! আর কিছুই করার নেই। কি হবে আর এখানে বসে থেকে মরা ছেলের মাথা কোলে নিয়ে। দ্রবময়ী সাবধানে ছেলেটার মাথাটা ধরে পথের ধুলোয় নামিয়ে দিলেন। তারপ উঠলেন। একহাতে তুলে নিলেন ভিজে কাপড়ের রাশ, গঙ্গাজলের ঘ অপর হাতে। কারো দিকে না তাকিয়ে কোন কথা না বলে এগিয়ে চললেন তিনি। পুলিশ অফিসাররা আর তাদের অধস্তন কর্মচারীরা আশ্চ চোখে তাকিয়ে রইল অপস্রিয়মাণা দ্রবময়ীর দিকে।

দ্রবময়ী বক বক করতে করতে চলেছেন,—'ছেলেটা রাস্তাতেই মরল কেউ একটু এগিয়ে এল না। ধরল না একটু। হাসপাতালে পাঠানর ব্যব করল না। এ দেশে কি আর মানুষ আছে, না শেষ হয়ে গেছে সব। শ্যা

কুকুরে ভরে গেল সারা দেশটা। দয়া মায়া নেই, মানুষে মানুষে ভাল-বাসা নেই, কেউ কারো জন্যে কাঁদে না—'

বলতে বলতে দ্রবময়ী অতীতে ফিরে গেলেন। আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে এক ঝড় জলের রাতে দ্রবময়ীর জোয়ান সমর্থ ছেলে তারই কোলের মধ্যে মাথা রেখে একটু একটু করে মরে গিয়েছিল। একটু সাহায্যের জন্য প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে আকুল ভাবে হাহাকার করেছিলেন দ্রবময়ী। চিৎকার করে কেঁদেছিলেন। ঝড় জলের শব্দে হয়ত সে চিৎকার কেউ শুনতে পায়নি, অথবা ঐরকম এক ভয়ংকর রাতে কেউ বাইরে বেরোতে চায়নি বলে না-শোনার ভান করেছিল। সহায়তার হাত বাড়িয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। সারা রাত অকথ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে ভোর রাত্রে ঠাণ্ডা নিঝুম হয়ে মরে গিয়েছিল দ্রবময়ীর ছেলে। মনে মনে সেই ঝড়ের গর্জন বৃষ্টির শব্দ মুখরিত রাতে চলে গিয়েছিলেন।

সহসা দ্রবময়ীর শোকার্ত ব্যাকুল তীক্ষ্ণ মরাকান্নার ধ্বনি হাজারটা ছুরির ফলার মত চারপাশের নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। চিৎকার করে কেঁদে উঠে দ্রবময়ী বলতে লাগলেন,—'মার কোলে ছেলে মরে গেল, কেউ একটু দেখলনা গো, কেউ একটু এগিয়ে এল না, মার কান্না কেউ শুনল না গো—'কাঁদতে কাঁদতে দ্রবময়ী সহসা ফুঁসে উঠলেন,—'ঝাড়ু মারি, সাত ঝাড়ু মারি পিথ্ থিমির মুখে, ভগবানের মুখে—'

দ্রবময়ী এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর প্রায় অবশ হাতে ধরা গঙ্গাজলের ঘটির কানা বেয়ে জলের ধারা পথে ছড়িয়ে পড়ছে।

আকুল তৃষ্ণার্তের মত পথের ধুলো সেই জল পলকে শুষে নিচ্ছিল।

তপু চলে যাচ্ছে

প্রলয় সেন

উমা এতক্ষণ গোছগাছে ব্যস্ত ছিল। মালপত্র খুবই সামান্য। একটা চামড়ার সুটকেশ। তাতে তপুর বইখাতা আর কিছু জামাকাপড়। এ ছাড়া একটা ছোট বেডিঙ।

শ্রাবণের শেষ বেলা। তপু খাটে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। জানলার ধারের পেয়ারা গাছটা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। ঘরে পর্যন্ত আলো নেই। উমা উঠে সুইচটা অন করল। তারপর শিয়রের কাছে এসে দমচাপা গলায় ডাকল, তপু এই তপু—

শেফালী রান্নাঘরে। কড়াই-এ খুন্তি ঘষার ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ শোনা যাচ্ছে। অবিনাশ বলে গেছেন, সন্দেসন্দি যেন রান্না শেষ হয়! দাক্ষায়ণী উঠোনে। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে বসে দূর্বা তুলছেন। নন্তু সামনের ঘরে। আজ ওকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়নি। একাচোরা বসে তপুর পেন্সিলের বাকসটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। কুয়োতলা থেকে ঠিকে ঝি পারুলের মা বাসন মেজে ফিরে আসছে।

ফের ডাকতে গিয়েও উমা থেমে গেল। তপুর মুখে একটা কালচে সর পড়ছে। মাথার চুলে ঝিনুক-কুচির মত পেয়ারার ফুল জড়িয়ে। তপু কোলকুঁজো হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাত খাটের বাইরে। চাদরের অনেকটা বুক থেকে খসে মেঝেয় লুটোচ্ছে। তপুর শোওয়া বরাবর বিশ্রী ধরনের। বছর দুতিনেক আগেও তপু উমার সঙ্গে শুত। তারপর হঠাৎ তপু কেমন বড় হয়ে উঠল। এখন সামনের ঘরে অবিনাশের সঙ্গে ও ঘুমোয়।

তপুর দিকে তাকাতে উমার বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে উঠল। কাল রাতে পাড়া ছেঁকে ছেলেছোকরাদের তুলে নিয়ে যাবার সময় পুলিশ তপুকেও রেহাই দেয়নি। অথচ, উমা জানে, তপু কখনো বাইরের সাতেপাঁচে থাকে না। লেখাপড়া আর অবসর সময়ে ছবি আঁকা ছাড়া ওর আর তৃতীয় কোন বাতিক নেই। তপুকে নিয়ে ভ্যানে তোলবার আগে সেকথা একবার

শেফালী পুলিশকে স্মরণ করিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। পুলিশের লোক উত্তরে বলেছেন এখন এসব কথায় কোনই লাভ হবে না। ওপরওয়ালার হুকুমে এসেছি। কাল থানায় আসুন। আগে ওকে আমরা ক্রস করি। তারপর ভাল বুঝলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।—শেফালী অবশ্য থানায় যায়নি। গিয়েছিলেন অবিনাশ। তপুকে নিয়ে ফিরতে বেলা ভেঙে এসেছিল।

রান্নাঘরে নন্তুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কতক্ষণ আর একা ঘরে থাকবে। শেফালী গনগনে গলায় বলছে, আঃ নন্তু! জ্বালাতন করিস না। যা না দিদির কাছে। কাল শেষ রাত থেকে গোটা বাড়িটা দম ফুরিয়ে যাওয়া ঘড়ির মত থমথমে। শুধু নন্তু আগাগোড়া বিকারহীন।

দাক্ষায়ণী উঠোন থেকে তাঁর ঘরের দিকে এগুচ্ছেন। এবার সিংহাসনের সামনে বসবেন। প্রদীপ জ্বালাবেন। ধূপধুনো দেবেন। তারপর ঠাকুরের দিকে মুখ করে বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ কিসব যেন আউড়ে যাবেন।

উমা নিচু হয়ে মেঝে থেকে চাদরের গড়ানো অংশটা তুলে আলতো করে তপুর গলা অবধি টেনে দিল। অবিনাশের ফিরতে আর দেরি নেই। উমা ভাবল, বাবা যতক্ষণ না ফিরছে ততক্ষণ তপু ঘুমিয়ে নিক। আজ সারাটা রাত ওকে ট্রেনে কাটাতে হবে।

উমা ঘর থেকে বারান্দায় নেমে এল। আকাশে সবে তারা ফুটতে শুরু করেছে। খুব ছেলেবেলার কথা উমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। তপু তখন মার পেটে। সন্ধ্যা হতেই দাক্ষায়ণীর হাত ধরে উমা উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে। তারপর আকাশে একটা দুটো করে তারা ফুটে উঠতে দাক্ষায়ণীর কাছে থেকে শেখা ছড়াটা সুর করে উমা পড়ত। সেই সঙ্গে দাক্ষায়ণী আঁচলে গিঁট বাঁধতেন। এবং এ সবই তপুর কল্যাণের কথা ভেবে।

শেফালী পারুলের মাকে বলছিল, তুমি এবার যাও বাপু। আর কোন কাজ নেই। কাল সকাল সকাল এসো কিন্তু। আসলে শেফালীর যা মনের অবস্থা তাতে করে কাউকেই বেশিক্ষণ বরদাস্ত করতে পারছে না।

উমা রান্নাঘরে ঢুকে নন্তুর হাত ধরে টানল, চল গপ্প বলব।

দাক্ষায়ণীর ঘর থেকে শাঁখের ফুঁ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা থেমে যাবার আগেই ধারে কাছে কোথাও পরপর কয়েকটা বোমা ফাটল। নন্তুকে নিয়ে উমা সামনের ঘরে চলে এল।

শেফালী রান্নার ফাঁকে আঁচলে চোখ মুছে যাচ্ছে। আজ সারাটা দিন ধরে কেবলই চোখে জল কাটছে। অবিনাশ তপুকে পৌছে দিয়েই বেরিয়ে গেছেন। সকাল থেকে পেটে জলটুকু পর্যন্ত গড়ায়নি। শাদা চোখে দেখলে অবিনাশকে রীতিমত শক্তপোক্ত মনে হয়। কিন্তু শেফালী জানে, আজ কুড়ি বাইশ বছর সে এ সংসারে, লোকটার ভেতরটা কি নরম। সামান্য বিপদের আঁচ গায়ে লাগলেই কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েন। তখন, অবিনাশ আর অবিনাশ থাকেন না।

নন্তু থেকে থেকে উমার চুল ধরে টেনে চেঁচিয়ে উঠছিল, কই, বলো দিদি। —তপুটাও ছেলেবেলায় গল্পপাগল ছিল। বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিল উমা। চিন্তাভাবনা ক্রমশই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ফের একটা বোমা ফাটল। খুব কাছে। উমার বুক দুরদুর করে উঠল। তার ধারণা আজকের রাতটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। এ এক অদ্ভুত খেলা।

পাড়ায় পুলিশ ঢুকলে ছেলেগুলোর রক্তচাপ যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। উমা উঠে গলির দিকের জানালাটা বন্ধ করতে গেল। গলির বাতিটা কে বা কারা নিবিয়ে দিয়েছে। দুপাশের বাড়িগুলোর দরজা জানালা সব বন্ধ। অন্ধকার ভয়াল হয়ে একটা অঘোষিত যুদ্ধের প্রস্তুতিতে থমথম করছে। একটা ভয় উমার বুকের ওপর হঠাৎ পাষাণের মত চেপে বসল। অবিনাশ এখনো ফিরছেন না। ওর তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত। হাওড়া থেকে গাড়ি সাড়ে আটটায় ছাড়বে। যে উমা, তপু সন্ধ্যের পর একটু দেরি করে বাড়ি ফিরলে শেফালীর মতই আশঙ্কা উদ্বেগে ছটফট করেছে,—সেই উমাই আজ, এখন চাইছে,—কত তাড়াতাড়ি তপুকে বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে পাচার করে দেওয়া যায়। শেফালী অবিনাশের কথা ভাবছিল। ছেলেকে পৌছে দিয়েই বেরিয়ে গেছেন। শেফালী বলেছিল, এক কাপ চা করি অন্তত। খেয়ে যাও।—অবিনাশ একটা বিড়ি ধরিয়ে মাথা নেড়েছিলেন, না, এখন আর দাঁড়ালে চলবে না।—শেফালী চুপ করে গেছে। মাস্টারী স্বভাবটা অবিনাশের হাড়ে মজ্জায় সেঁধিয়ে গেছে। অবিনাশ সদর দরজায় মুখ পর্যন্ত এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলেন, শেফালী, শোনো।—শেফালী এগিয়ে যেতে অবিনাশ চাপা গলায় বলেছিলেন, তোমার কাছে টাকা পয়সা কিছু আছে?—শেফালী প্রমাদ গুনছিল। মাসের শেষ। লক্ষ্মীর ঝাঁপি নস্তর কৌটো-ব্যাঙ্ক বাক্সপ্যাটরা

সব কিছু আঁতি পাঁতি করে, হাতড়েও কুলো দশটা টাকা হবে না। তবু জিজ্ঞাসু গলায় শেফালী শুধিয়েছিল, কত টাকা ?—অবিনাশ চোখের দৃষ্টি ঘন করেছিলেন, টাকা তো অনেক। আজ ইস্কুলে যেতে পারলে যা'হক করে জোগাড় করে ফেলতাম। শ'খানেক টাকা দরকার।—শেফালী নিবে যেতে যেতে থমকাল। জলে ডুবতে থাকা মানুষের মত শেষ উপায়টা বার করে ফেলল, উমার হাতের বালা দুটো বন্ধক দিয়ে।—অবিনাশ হাসলেন, নাহ্ থাক।—তারপর ঠেলে গলিতে পড়লেন।

দাক্ষায়ণী এখন আলোর কাছে। শানকিতে কিছু খই নিয়ে ধান বাছতে বসেছেন। বর্ষাকাল। পেটের গণ্ডগোলের ভয়ে কিছুদিন হল রাত্তিরে রুটির বদলে খই খাচ্ছেন।

তপু জেগে গেছে। মাঝের ঘর থেকে ও তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠল, মা, ওমা! রান্নাঘর থেকে শেফালী বলে উঠল, ছাখ্ তো উমা। তপু কি চাইছে।—আসলে থানা থেকে ফিরবার পর থেকেই শেফালী তপুকে এড়াতে চাইছে।—ওর দিকে সোজাসুজি তাকালেই শেফালীর বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে ওঠে। কথা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তপু আগাগোড়া পালটে গেছে। হাসিখুশি প্রাণবন্ত ছেলে, কেমন অকালগম্ভীর আত্মমগ্ন; নিজের ছেলে বলেই মনে হয়না শেফালীর।

উমা মাঝের ঘরে ঢুকতে তপু বলল, বাবা ফিরেছে ?—উমা মাথা নাড়ল, না।—তপু মাথা নিচু করল, গামছাটা দিদি! তপু কি লজ্জা পাচ্ছে। কিংবা কোন অপরাধ-বোধ ওর ভেতর কাজ করে যাচ্ছে! নইলে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে না কেন ?—উমা হাসতে চাইল, এই ভর সন্ধ্যায় স্নান করবি।—তপু নন্তুর দিকে চোখ তুলল। রহস্য করে বলল, হাঁ করে আমায় কি দেখছিস। আয়, কাছে আয়।—উমা আর ঘাঁটাল না। গামছা খুঁজতে বারান্দায় চলে গেল।

অবিনাশ ফিরলেন ঠিক সাতটার সময়। ততক্ষণে তপুর স্নান খাওয়া শেষ। নন্তুটা, সারাদিনের একটানা ধকলের পর, ঘুমিয়ে পড়েছে। অবিনাশ খুব আস্তে করে সদর দরজায় টোকা দিচ্ছিলেন। বাইরের আলো না জ্বালিয়েই শেফালী এগিয়ে দরজা খুলল। ভেতরে পা দিয়েই অবিনাশ ফিসফিসিয়ে উঠলেন, তপুর খাওয়া হয়ে গেছে? শেফালী উত্তর করল, হ্যাঁ। টাকা পেয়েছ ?—অবিনাশ আরো কাছে এগিয়ে এলেন, পেয়েছি। ভবতারণ

বাবুকে অনেক ধরে করে—। —ভবতারণবাবু কোন এক সওদাগরি অফিসের বড় চাকুরে। অবিনাশ ওর ছেলেকে পড়ান।

বারান্দায় উঠে অবিনাশ ডাকলেন, উমা—। গোটা বাড়িটা সাড়াহীন। দাক্ষায়ণী নিজের ঘরে। আলো নিবিয়ে আধশোয়া পড়ে আছেন। অবিনাশ না ফেরা অবধি দাক্ষায়ণী রাতের খাওয়া খান না। উমা মাঝের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে অবিনাশ বললেন, তপুর বইগুলো সব বাক্সে দিয়ে দিয়েছিস তো ?—উমা মাথা নাড়ল। ফের বৃষ্টি-ভেজা বাতাস বাড়িময় ভারি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। অবিনাশ ভেতরে ঢুকে তপুকে বললেন, পৌঁছেই চিঠি দিস কিন্তু।—তপু খাটে বসে পায়ে মোজা গলাচ্ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেবো।—অবিনাশ ফের বললেন, শীতল নিয়ে যাবে তোকে। আমি অবশ্য স্টেশন অবধি পৌঁছে দিচ্ছি।—তপু বাবার কথায় উত্তর করল না। মেঝে থেকে স্যুটকেশটা হাতে তুলে নিল। তপুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে কেমন এক অপরাধ-বোধে অবিনাশ যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছিলেন। ভরদুপুরে থানা থেকে ওকে খালাস করে বড় রাস্তায় পড়বার পর অবিনাশ ছেলেকে চাঙা করে তোলার জন্যে একটানা বকর বকর করে যাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ এক সময় তাঁর মনে হয়েছে, যাকে তিনি ভরসা দিচ্ছেন, সেই তপু, তেমন একটা ঘাবড়ে যায়নি। বরং, তিনি নিজেই ছেলের চেয়ে ভেতরে ভেতরে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। অবিনাশের অজস্র কথার ফাঁকে তপু একবার শুধু রা কেড়েছিল। তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিল, তুমি এত ভাবছ কেন বাবা। যা হবার তা-ই হবে।

উমা পাশের ঘর থেকে দাক্ষায়ণীকে ডেকে নিয়ে এল। অবিনাশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দাক্ষায়ণী মাজায় হাত রেখে কুঁজো শরীরটাকে সামলাতে সামলাতে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, ডাকছিলি অবু ?

অবিনাশ কাপড়ের খুঁটে চশমার কাচ মুছে নিলেন, তপু চলে যাচ্ছে মানে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

দাক্ষায়ণীর চোখের মণিদুটো স্থির হয়ে এল, তপু যাচ্ছে, কোথায় ?

—বালুরঘাটে।

দাক্ষায়ণীর পিঠের কুঁজটা ওঠানামা করছিল। দুচোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে। তিনি ভেঙে ভেঙে বললেন, অসময়ে বালুরঘাট কেন ? কলেজের পড়া নষ্ট হবে না ! সামনেই তো পুজোর ছুটি, তখন—

উমা বেডিঙটা দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অবিনাশ আমতা আমতা করে বলল, না, ঠিক বেড়াতে পাঠাচ্ছি না। কাল রাতে পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল। পাড়ার অবস্থা খুবই খারাপ। তাই ভাবছি কিছুদিন মামাবাড়িতে কাটিয়ে আসুক।

দাক্ষায়ণী বড চোখ করে ছেলের ভাবগতিক বুঝতে চাইলেন। তাঁর বহুদিন আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেদিনটাও ছিল এমন শ্রাবণের শেষ সন্ধ্যার সময়। বাড়ি ফিরে অবিনাশ দাক্ষায়ণীকে ডেকেছিলেন। মার পরামর্শ ছাড়া অবিনাশ কোন কাজ করেন না। আড়ালে ডেকে বলেছিলেন, আর তো এখানে থাকা যাবে না মা। দাক্ষায়ণী শুধিয়েছিলেন, কেন, কি হল? অবিনাশ উত্তর করেছিলেন, দেশ ভাগ হয়ে গেল। একে একে সবাই চলে যাচ্ছে—দাক্ষায়ণী তেতোমুখে বলেছিলেন, তাই বলে সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে? অবিনাশ মলিন হেসেছিলেন, কি আর করা যাবে। সবাই তো চলে যাচ্ছে।

দাক্ষায়ণী সেদিন আর কোন প্রশ্ন করেন নি ছেলেকে। আজ করলেন, পাড়ার অবস্থা ভাল নয়, তাতে ওর কি। তপু তো কিছুর মধ্যে নেই!

ওপাশ থেকে তপু নড়ে চড়ে উঠল। হয়ত ওরও এই একই প্রশ্ন অবিনাশের কাছে। তবে জিজ্ঞাস্য বিষয়টা অন্য ধরনের। ছেলেবেলা থেকে অবিনাশ ছেলেকে নিজের মত করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। বারবার বলে এসেছেন অবিনাশ, অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোটাই হল মনুষ্যত্ব। আর আজ, একটা দিনের সামান্য ঘটনায় অবিনাশ সে কথা ভুলে গেলেন কি করে।

অবিনাশ চুপ করে গেলেন। দাক্ষায়ণীর প্রশ্নের উত্তরটা তার জানা নেই। যেমন নেই ছেলের চোখে চোখ রেখে কথা বলার মত সাহস। এতকালের কিছু ধারণা-ভাবনা সব ছাপিয়ে এ-কথাটাই আজ অবিনাশের কাছে বড় হয়ে উঠছে যে, তিনি আসলে তপুর পিতা। নইলে, এ সত্য কথাটা তাঁর চেয়ে কে আর ভাল করে জানে যে, তাঁর সন্তান কতটা নির্দোষ। তবু, এই মুহূর্তে তিনি অসহায়, প্রতিকারহীন। তিনি বুঝে গেছেন, সত্যের চেয়েও বর্তমানটা অনেক মারাত্মক। তপু নিরপরাধ সত্য কথা। কিন্তু ওর বয়েসটা, শুধু ওর ক্ষেত্রে নয়, সমস্ত দেশের এই বয়সী ছেলেদের ক্ষেত্রেই, সবচেয়ে বড় শত্রু।

দাক্ষায়ণী ছেলেকে নিরুত্তর দেখে ফের বললেন, তুই সঙ্গে যাচ্ছিস তো? অবিনাশ এতক্ষণে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, না, আমি যাচ্ছি না। শীতল যাবে। শীতলকে ফোনে বলে রেখেছি। ও স্টেশনে হাজির থাকবে। —শীতল শেফালীর ছোট ভাই। কিছুদিন হল চাকরির খোঁজে কলকাতায় এসেছে। উঠেছে ওর কাকার বাড়ি। দাক্ষায়ণী ভ্রূ কোঁচকালেন, তা তুই যখন ঠিক করে ফেলেছিস তখন আমি আর কি বলব। তবে, হ্যাঁরে, বালুরঘাট জায়গাটা তো ভাল?

দাক্ষায়ণীকে হঠাৎ কেমন মারমুখী লাগছে। ওঁর কথাটা ছুরির ফলার মত অবিনাশের বুকে গিয়ে বিঁধল। এ প্রশ্নটা আরো ভয়ঙ্কর। গণ্ডগোল কি শুধু কলকাতা শহরেই। সারা দেশটাই তো জলছে। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি কোথাও আছে।

অবিনাশ এ কথাটা যে একেবারে ভাবেন নি তা নয়। তবু, তিনি পিতা বলেই ছেলের প্রতি দায়িত্ব কিংবা মমতাবশত বর্তমানকে এড়াবার অক্ষম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অবিনাশ চালসে গলায় বললেন, যদ্দূর জানি মা, বালুরঘাট এখনো ভালই আছে।

তারপরের পর্বটুকু সংক্ষিপ্ত। তপু একবার ঘুমন্ত নন্তুর মাথায় হাত বুলিয়ে ফিরে এল। তারপর দাক্ষায়ণী আর শেফালীকে প্রণাম করল। উমা ছলছল হেসে বলল, আমায় করলি না তপু?—স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ভেংচি কেটে তপু দিদির কথার জবাব দিল।

সদর দরজা অবধি উমা এগিয়ে এসেছিল। গলির নিকট অন্ধকারে নেমে তপু শেষবারের মত বলল, দিদি চলিরে।

দাক্ষায়ণী নিজের ঘরে চলে গেছেন। আলো না জ্বেলেই খাটে উঠে গেলেন। শেফালী সামনের ঘরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। একটা নিশ্চল পাথরের মূর্তি যেন। পাশের ঘরে নন্তু ঘুমের ভেতর ককিয়ে উঠছে। শেফালী জানে, আরো ছ'সাতটা বছর নন্তুকে নিয়ে তার কোন দুশ্চিন্তা নেই। উমা সদর দরজার চৌকাঠে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে গলির অন্ধকার ছায়ামূর্তি দুটোকে গিলে ফেললে উমা একবার আকাশের দিকে মুখ তুলল। শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার রাত। বৃষ্টি শেষ হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলেও একটা তারাও চোখে পড়ে না। শুধু, হঠাৎ একবার দেখা গেল, আকাশের অনেক গভীর থেকে, একটা হলুদ রঙের অশুভ উল্কা

চারপাশে আলো ছিটোতে ছিটোতে তীরের বেগে খানিকটা নেমে এসে মাঝপথে মিলিয়ে গেল। এতক্ষণে শেফালী, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, নীরবে একটানা কাঁদবার সুযোগ পাচ্ছে।

আর ওদিকের ঘরে, খাটের ওপর দুহাত প্রসারিত করে দাক্ষায়ণী বালিশ কিংবা অন্য কিছু একটা কেবলই খুঁজে যাচ্ছেন। আর থেকে থেকে বলে উঠছেন, দেশে কি আর মানুষ নাইরে। সব কি মরে ভূত হয়ে গেল!

একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা

তপোবিজয় ঘোষ

সম্পাদক মশাই, প্রতিশ্রুতি মতো একটি গল্প এ মাসে পাঠাতে পারলাম না বলে দুঃখিত। সম্প্রতি আমি একটি গুরুতর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি এবং মহান গণতন্ত্রের সাংঘাতিক শত্রুরূপে চিহ্নিত হয়ে জামিনে খালাস অবস্থায় মামলার তদ্বিরে ব্যস্ত আছি। সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনলে আমাকে নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন।

কিছুদিন থেকেই আমার ইচ্ছা, এ কালের রকবাজ মস্তানদের নিয়ে একটা জমজমাট গল্প লিখব। হালের বাংলা সাহিত্যে এর খুব চল্ দেখছি। ছোট বড়ো সব্বাই যে যার ক্ষমতা মতো এ তল্লাটে ঢু মারছে আর রাতারাতি রামায়ণতুল্য বই নামিয়ে দু'হাতে পয়সা লুটছে। আমার নামডাক তেমন না থাকুক, তবু প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকি কেন। আর এসব লেখা এমন কি আর কঠিন কাজ! বোমা-পিস্তল-মদ-মাগী সহকারে দিব্যি বাঁধা একটা ছক আছে, সঙ্গে কিছু রাজনীতি, সমাজনীতি, কিছু হা-হুতাশ, চোখের জল! ও টেকনিক আমি জানি। শুরু করলে শেষ করার ভাবনা নেই।

কিন্তু সম্পাদক মশাই, অত ফাঁকি দিয়ে আমি লিখতে চাইনি। ওদের হাবভাব ভাষাভঙ্গি চালচলন নিয়ে আমি একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চেয়েছিলাম। ওদের ভাবনা-চিন্তার একটু ভেতরে ঢুকব বলে স্থির করেছিলাম। সংক্ষেপে, আমি ওদের 'ক্যারেকটার স্টাডি' করতে গিয়েছিলাম। আর ওই হল আমার কাল। এখন লেখা-টেখা সব মাথায় উঠেছে, চাকরি নিয়ে টানাটানি। গণতন্ত্রের মহিমায় অধিকন্তু হাজতবাস না হয়ে যায়।...বলি শুনুন।

আমাদের গলির মুখেই চায়ের দোকান। তার মুখোমুখি একটি পুরনো তিনতলা বাড়ির তেকোনা বারান্দা। সেখানে জন সাতেক ছোকরা দিবারাত্র গুলতানি করে। ওরাই এ পাড়ার মস্তান। বয়স আঠারো থেকে পঁচিশ। গড়পড়তা চেহারা, চোয়াল-ওঠা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রুক্ষ উড়ন্ত চুল, চোঙা প্যাণ্ট, হরেকরকম শার্ট, ঠোঁটে সিগ্রেট অষ্টপ্রহর ধূমায়িত। এ কালের

মস্তান সমাজের অন্যসব গুণেও ওরা গুণান্বিত। অর্থাৎ চুরি-চামারি করে হায়ার সেকেণ্ডারি বা পার্ট ওয়ান পাশ, বেকার বাউণ্ডুলে, চাকুরির সন্ধানে মাঝে মাঝে ইতিউতি ঘোরে, মারামারির সময় সোডার বোতল বা লোহার রড নিয়ে দাপাদাপি করে, দাঙ্গার সময় দোকানে লুটের ধান্ধায় থাকে, শান্তিকালে চাঁদা তোলে, প্যাণ্ডেল বাঁধে, ফাংশন করে, ভোট পর্বে বড়ুবাবুর হয়ে পোস্টার লেখে, প্রচার করে, জিতলে প্রকাশ্যে মদ টেনে রাস্তায় টুইস্ট নাচে এবং সবশেষে গলিমুখে বুকপিঠ খোলা অথবা আখোলা বেপাড়ার কোনো তন্বী তরুণী দেখলেই সরব উচ্চকিত শিসধ্বনিসহ, আহ্, কলেজটা খুবলে নিয়ে গেল মাইরি বলে আর্তনাদ করে ওঠে।

আমি যেতে আসতে ওদের দেখি। কখনো চাঁদা আদায়ে বাড়িতেও আসে। কথাবার্তা বড়ো একটা হয় না। সাধ্যমতো এড়িয়ে চলি। আপনি তো জানেন, আমি মানুষটা বড়ো নিরীহ, শান্তিপ্রিয়। কোনো ঝুট-ঝামেলা একেবারেই পছন্দ করি না। সেই বাল্যকাল থেকেই শান্তশিষ্ট ছেলে হয়ে পড়াশুনো করেছি। এখন কোঁচানো ধুতির উপর নিভাঁজ পাঞ্জাবি ছুলিয়ে ছাতা মাথায় কলেজে পড়াতে যাই, একটা দুটো টিউশনি করি, ফাঁকেফুঁকে যৎসামান্য সাহিত্যচর্চা। ওইসব মস্তানেরা, প্রতি মাসেই পুলিশের কালো গাড়ি যাদের একবার করে তাড়া করে, আমার কাছে ভয়ঙ্কর জীব। আমি সংক্রামক রোগের মতোই ওদের দূরে রাখি। কলেজের মাস্টার বলে ওরাও সম্ভবত আমাকে করুণাপূর্বক সামান্য সমীহ করে, কেননা চাঁদাপত্রের ব্যাপারে ওরা আমার ওপর খুব একটা চাপ সৃষ্টি করে না।

এখন গল্পের প্রয়োজনে আমি ওদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে সচেষ্ট হলাম। ওদের দলনেতা ঢ্যাঙামতো একটা ছেলে। ভালো নাম জানিনে, সবাই ডাকে পটাশ বলে। আমি ভিড়বাট্টায় নাক গলানোর ঝুঁকি না নিয়ে শুধু পটাশকেই হপ্তাখানেক 'স্টাডি' করব বলে ঠিক করলাম।

সম্পাদক মশাই, তখন কি জানতাম, ওই পটাশের পেছনে ওৎ পেতে আছে যে পুলিশের গাড়ি সে বাছবিছার করে না। নাগালের মধ্যে যাকে পায় টেনে তোলে! তারপর নিপুণ হাতে মামলা সাজিয়ে নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করতে চায় আমরা সবাই শত্রু। দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখছে একমাত্র বড়ুবাবুরাই!

এখন এ সব থাক। ঘটনাটা বলি শুনুন—

পটাশকে বাড়িতে ডেকে পাঠানোর জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম। এমন সময় এক রবিবারের সকালে দরজার কড়া সশব্দে বেজে উঠল। বেপরোয়া ভঙ্গি থেকে অনুমান করলাম ছাত্রটাত্র না, মস্তানরাই কেউ এসেছে। ওদের আবির্ভাব এমন সাড়ম্বরেই ঘোষিত হয়।

একটু পরেই আমার মেয়ে নীলা এসে বলল, 'বাবা, পটাশদা এসেছে।'

শুনে আমি নীলার মুখ দেখলাম। পটাশ কোনদিন ওর 'পটাশদা' হয়ে গেছে টের পাইনি তো! ভাগ্য ভালো ওর বয়স এখনো দশ পেরোয়নি। তাহলে আমাকে নতুন বাসা দেখতে হত।

বললাম, 'কেন? পটাশদা কেন? চাঁদা চাইছে বুঝি?'

'না। তোমার কাছে আসবে বলছে।'

'তাহলে পথ দেখিয়ে নিয়ে এস মা। আর দেরি করো না।'

আমার কথা বলার ধরনে নীলার মা মুখ টিপে হেসে অন্য ঘরে উঠে গেল। নীলা কি বুঝল কে জানে, বেশ গম্ভীর হয়ে পটাশদাকে আনতে গেল। আমি লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমাখানা চোখে এঁটে অধ্যাপকসুলভ নিরীহ মহিমায় নিজেকে মণ্ডিত করলাম। এখন এ পাড়ার স্বনামধন্য মস্তান নেতার সঙ্গে আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হবে। কে জানে কি মতলবে এসেছে ও।

একটু পরে পটাশ ঢুকল। আমার আগামী গল্পের নায়ক। আমি দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে ওর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে দেখলাম। ওর বেশভূষা, চোখ-মুখ, হাতের চওড়া কবজি, বোতাম-খোলা বুক, ডান গালের ছোট্ট একটি আঁচিল···সব কিছু। দাঁড়ানোর সময় বাঁ দিকের হাতটা আধখানা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ডানদিকে সামান্য ঝুঁকে থাকার ভঙ্গিটুকু পর্যন্ত দেখতে ভুল করলাম না। তাতে পটাশ বিশেষ বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'কি স্যর চিনতে পারছেন না নাকি?'

আমি পরস্পরের সম্পর্কটা সহজ করে তোলবার জন্য মৃদু হেসে বললাম, 'তোমাকে চেনে না কে? এ পাড়ায় আমরা ত তোমারই আশ্রিত।'

পটাশ ভুরু কুঁচকে, ডানগালের কালো আঁচিল নাচিয়ে মিহি গলায় বলল, 'ঠাট্টা করছেন!'

আমি তৎক্ষণাৎ, 'আরে না না! আমার মেয়ে সব সময়ই বলে তোমার কথা···'

'কে? নীলু? ও স্যর একটা জিনিয়াস!' পটাশের সারামুখ মুহূর্তে দপদপিয়ে উঠল, এপাশে ওপাশে তাকিয়ে নীলাকে খুঁজতে খুঁজতে আরো

দু'পা এগিয়ে এল। টেবিলের একটা কোনা খামচে ধরে উৎসাহে আবেগে দ্রুত বলে গেল, 'এই বয়সেই অমন গান গায় স্যর—একেবারে পাড়া মাৎ! আর দু'চার বছর গেলে আর বাইরের আর্টিস্ট আনতে হবে না! আপনি ওকে ঠিকমতো ট্রেনিং দিয়ে যান স্যর—'

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে মনে ভাবলুম, পাড়ার ফাংশনে নীলার এবার গান গাওয়া বন্ধ করতে হবে। ও যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। এখন থেকে রাশ না টানলে পরে বানের জল ঘরে ঢোকার আশঙ্কা আছে।

মুখে বললাম, 'তখন আমার চাঁদাটা একটু কম করে ধরবে তো তোমরা?'

'কি যে বলেন স্যর···হে···হ্'

হাসবার সময় পটাশের একটা দাঁতও বের হল না—গলায় একরকম অদ্ভুত শব্দ হল মাত্র, এটা খুব আশ্চর্য ঠেকল আমার কাছে। আমি মনে মনে নোট করলাম।

'তুমি বসো পটাশ।'

এই সাদর আমন্ত্রণে পটাশ খুশি হয়েই চেয়ার টেনে বসে পড়ল। টেবিলের ওপর থেকে কাচের পেপার ওয়েটটা তুলে অকারণেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একটা বইয়ের মলাট ওলটাল, পিনকুশনটা থেকে একটা পিন তুলে আবার ঢোকাল। তারপর লাল পেন্সিলটায় হাত রাখল। এরা যে কত অস্থির, অসহিষ্ণু আমি নিঃশব্দে লক্ষ্য করলাম। রুচি ও সৌজন্যবোধের দিকটা অবশ্য আর ভাবলাম না, ওসবই এই জেনারেশনের কাছে আশা করাই অন্যায়। ডাইরেক্ট ছাত্ররাই এখন নাকের ডগায় ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেট ফোঁকে, এরা ত তার তিন কাঠি ওপরে, পাড়া-কাঁপানো মস্তান! আমার সিগারেটের বাক্সটা থেকে এতক্ষণ যে একটা তুলে নিচ্ছে না—এইটুকুই ত যথেষ্ট।

পেন্সিলের গোড়ার দিকটা কপালের ঠিক মাঝখানে চেপে ধরে পটাশ বলল, 'এই গরিবের একটা উপকার করবেন স্যর?'

'কি?'

'আগে জবান্ দিন স্যর, করবেন?'

'জবান' শব্দটা কানে খট্ করে বাজল। মাথার ভেতরটা কেমন গরম হয়ে উঠল। মনে হল শব্দটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়ায় পটাশও একটু বিব্রত। আমি রাগ করলাম না। শব্দটাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করলাম। জানি, এই মস্তানদের এক ধরনের বিচিত্র ভাষা, চিহ্ন কোড ল্যাংগুয়েজ আছে। নানা

জায়গা থেকে আমি তার কিছু কিছু সংগ্রহ করেছি। আমার গল্পে দরকার হবে। আরো কিছু পটাশের কাছে ক্রমে জেনে নিতে হবে। উচ্চারণভঙ্গি লক্ষ্য করতে হবে। অর্থ বুঝতে হবে। কাজেই এক 'জবান'-এই রাগ করলে চলবে কেন! শিল্পীকে নিরাসক্ত হতে হয়। না কি বলেন, সম্পাদক মশাই?

কিন্তু ব্যাপারটা কি? এ যে বিষয় ভাবনার। বাঘের গলা থেকে কাঁটা বের করার শামিল। শেষকালে হাতে দড়ি পড়বে না ত! শুনেছি দোকান-লুঠ-করা নানারকম চোরাই মাল ওদের হেফাজতে থাকে। অনেক দামি জিনিসের পাশাপাশি নতুন শাড়ি, জুতো, চামড়ার স্যুটকেশ। পয়সার টান ধরলে পাড়ারই চেনাজানা বাড়িতে ঢুকে একটু কমে-সমে বিক্রি করে। আমাকে কি কিছু কিনতে বলবে? বেশ মোটা টাকার কিছু? দিন কয়েক আগে হরতালের সময় বড় রাস্তার ঘড়ি-রেডিও-গ্রামোফোনের দোকানটা লুঠ হয়েছিল শুনেছি--

খুব নার্ভাস ভঙ্গিতে শুকনো গলায় বললাম, 'কি করতে হবে বল।'

পটাশ সেই লাল পেন্সিলের গোড়া দিয়ে গালের আঁচিলটায় সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলল, 'আমার এক ভাই স্যর, এ বছর হায়ার সেকেণ্ডারি টপকে গেছে। ওকে আপনার কলেজে ভর্তি করে দেবেন?'

শুনে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হল। চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিলাম।

'তোমার আপন ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা ক' ভাইবোন?'

'পুরো এক গণ্ডা!'

'তুমি বড়?'

'হ্যাঁ।'

দেখলাম, প্রশ্নের চাপে পটাশ বিরক্ত হয়েছে। ওর চোখের পাতা কুঁচকে গেছে। কপালে ভাঁজ পড়েছে। হাতের পেন্সিলটা গালের মাংসে গভীরভাবে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। আমি একদিন আর বেশি অগ্রসর হতে সাহস করলাম না। আস্তে আস্তে ওর পারিবারিক সমস্ত ইতিহাস আমাকে জানতে হবে। গল্পে আমি বাস্তবতার ছন্দ আনতে চাই। আমি কাজের কথায় ফিরলাম, 'তোমার ভাই কোন ডিভিশনে পাশ করেছে?'

'দুই দাঁড়ি স্যর। তাইত কলেজে পড়ার জন্যে তড়পাচ্ছে—'

'তা তোমাদের বদুবাবুত শেয়ালদা কলেজের গভর্নিং বডির মেম্বার। তাকে বলো না কেন ?'

'শেয়ালদা কলেজ? ওটাত একটা খাটাল। আর বদুবাবুর কথা বলবেন না স্যর—'

'কেন ? কি হল ?'

'শ্লা এক নম্বর হারামি। ভোটে গাড্ডু মেরে আমাদের আর পাত্তা দেয় না!'

'হুঁ!'

এ বিষয়েও আমি আর প্রশ্ন বাড়ালাম না। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বসু এ তল্লাটের একজন ডাকসাইটে লোক। রাজ্যপাট আজ না থাকলেও ক্ষমতা কিছু আছে। ভালো না করুক আমার বিলক্ষণ ক্ষতি করতে পারে। ওই পটাশরা তার ডানহাত। এক রকম তারই তালিমে তৈরি। কোনো কারণে এখন হয়ত একটু মন কষাকষি চলছে। কিন্তু সেটা দাম্পত্য কলহের মতোই, পরিণামে মিলনান্তক হয়ে দাঁড়াবে। মাঝখান থেকে বদুবাবুর নামে বেফাঁস কিছু বলে আমি কেন বিপদে পড়ি।

বললাম, 'তোমার ভাইকে কাল কলেজে যেতে বলো। কি করা যায় দেখব।'

পটাশ খুব খুশি হয়ে বলে উঠল, 'আপনি দেখলেই হয়ে যাবে স্যর! নিঘ্ঘাৎ।'

পটাশ চলে গেলে আমি এ ব্যাপারে একটু ভাবিত হলাম। ওর ভাইকে কলেজে ভর্তি করে দেওয়া খুব কঠিন কাজ না, বিশেষ করে সেকেণ্ড ডিভিশনে যখন পাশ করেছে। কিন্তু পটাশের মতো একটা বখাটে গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলের জন্য এই কাজটুকু আমি করব কিনা। পটাশের ভাইটা কি প্রকৃতির কে জানে। চুরি-চামারি করে পাশ করেছে কিনা তারই বা কি ঠিক। কলেজে ঢুকে যদি কিছু গণ্ডগোল বাধায় প্রিন্সিপাল হয়ত ডেকে বলবেন, 'কেমন ছেলেকে রেকোমেণ্ড করেছিলেন মশাই' তখন রীতিমতো লজ্জার ব্যাপার হবে।

আবার ভর্তি না করার পক্ষেও কোনো যুক্তি নেই। এই পাড়ারই ছেলে। কাজেই একটা পাড়াগত কর্তব্য আছে। তার ওপর পটাশের ভাই—যে পটাশ কিনা আমার আগামী উপন্যাসের নায়ক! নায়কের এই অনুরোধটুকু আমার রাখা উচিত। হয়ত এটুকু করলে ওর ভাইটা আর-একটা পটাশ হওয়ার হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাবে।

নম্বর কিছু কম ছিল তবু সায়েন্স গ্রুপেই আমি ভর্তি করে দিলাম। দেখে শুনে মনে হল পলাশ এখনও ততটা পেকে ওঠেনি। চালচলন কথাবার্তা বেশ মার্জিত। নাবালক মুখে নিম্নবিত্ত পরিবারের লাবণ্যহীন রুক্ষতা জামা প্যান্টেও দারিদ্র্যের ছাপ। পটাশের সঙ্গে ওর কোথাও বিশেষ মিল নেই।

ওকে ভর্তি করার পর পটাশ একদিন বলে গেল, 'খুব উপকার করলেন স্যর! ভুলব না।'

আমি বললাম, 'তোমাকে ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি পটাশ—'

'বলুন স্যর।'

'তোমার বাবা ত শুনলাম একটা ওষুধের দোকানে কাজ করেন। সামান্যই মাইনে পান। পলাশের পড়ার খরচ কে চালাবে?'

'কেন! বলেছি ত আমি চালাব!'

'তুমি কোথায় পাবে?'

পটাশ একটুও না-ভেবে বলল, 'সে আপনি ভাববেন না। পয়সা রোজগারের রাস্তা অনেক।'

'বড়ুবাবু দেবে?'

'বড়ুবাবু?' দপ্ করে যেন জ্বলে উঠল, 'শালা বেইমানের পয়সায় আমি পেচ্ছাপ করি!'

'পেচ্ছাপ' শব্দটা তীরের মতো কানে এসে বিঁধল। আমি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। পটাশ খুব উত্তেজিত। ওর কোনো ভাবান্তর ঘটল না। বড়ুবাবুর নামে অমার্জিত কর্কশ গলায় আরো কিছু গালাগালি দিয়ে গেল সে। বুঝলাম, কলহটা এবার একটু বাড়াবাড়ি রকমের। তারপর পটাশ চলে যাওয়া মাত্র আমি ডাইরি খুলে বসলাম। ওর ক্রুদ্ধ চেহারার ভঙ্গিটি বড় মনোরম—ছবির মতো এঁকে ফেলতে হবে। আর ওই গালাগালির শব্দগুলিও একটি একটি করে লিখে রাখতে হবে। আমার উপন্যাসের নায়ক হবে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ। আমি তার বহিরঙ্গে কোথাও কোনো খুঁত রাখব না।

সম্পাদক মশাই, তারপর বেশ কিছুদিন পার হল। পটাশের আর দেখা নেই। আমি লেখার কাজটা সবে শুরু করেছি। পটাশকে একবার দরকার অথচ ত্রিতল বাড়ির বারান্দা কদিন থেকে ফাঁকা। ওর বন্ধুরাও কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। গলির মুখে একটা পুলিশের গাড়ি কদিন হল আনাগোনা

শুরু করেছে। ওদের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে এই গাড়িটার কোনো যোগ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

শুধু কালো মতো সেই রোগা মেয়েটা যার মাথায় চুল বিস্তর, চোখ দুটো টানাটানা ও গভীর, সে প্রত্যহ একটা উদাস ভঙ্গি নিয়ে দক্ষিণের হলুদ বাড়ির জানালায় রাস্তার পানে চেয়ে বসে থাকছে। তার সঙ্গে পটাশের প্রেম আছে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ একদিন আমি মেয়েটাকে ওপর থেকে কমলালেবু ছুড়তে এবং নিচে থেকে পটাশকে তা কোমর দুলিয়ে লুফতে দেখেছি। আমার লেখায় ওকেই নায়িকা করতে হবে। তারপর যথারীতি মানসিক ভাব ও শারীরিক তাপ বিনিময়ের—

কিন্তু পটাশ সাহেব গেল কোথায়? পলাশকে জিজ্ঞেস করে কিছু জানা গেল না। নীলার কাছে খোঁজ করলাম। দেখলাম ও অনেকের বাড়িই চেনে। বলল, 'গণেশদাকে ডেকে আনব বাবা ওই টিনের ঘরগুলোতে থাকে—'

বললাম, 'একবার ডেকে আন দেখি।'

মিনিট দশেক পরে গণেশের আবির্ভাব। একটি ক্ষুদ্র মস্তান। বয়স বোধ হয় সতেরো পার হয়নি। নাকের ডগায় গোঁফের রেখা অস্পষ্ট। কিন্তু সমস্ত মুখটা পাথরের মতো জমাট। যেন ধারালো ছুরি। বিড়ি টেনে ঠোঁটে কড়া পড়ে গেছে। হাতের কব্জিতে আবার একটা রুমাল বাঁধা! ও না-কি ভালো গীটার বাজায়, নীলা বলছিল। এইসব ছেলেদের সম্পর্কে নীলার এমন কৌতূহল গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু বাসা বদলানোর কথা ভেবে কি লাভ। কোলকাতার কোন্ গলি আজ মস্তান-শূন্য!

হঠাৎ ডাক পাঠানোয় গণেশ বিস্মিত। প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে। আমি ওকেও একটু 'স্টাডি' করে বললাম, 'তোমাদের পটাশদা কোথায়?'

'কেন? তাকে কি দরকার?'

'আছে। কোথায় সে?'

'আগে কি দরকার বলুন!'

ওরে বাস্! ছোটোখাটো হলে কি হয়, এ যে একেবারে জাত গোখরো! কথা বললেই. ফোঁস করে ওঠে।...ঠিক আছে! নায়কের সঙ্গে সহনায়ক করা যাবে ওকে। কিংবা প্রতিনায়ক। আর মাঝখানে ওই ড্যাবড্যাবে-চোখো মেয়েটা—চমৎকার ত্রিভুজ হবে।

'এখন কিছুদিন আসবে না।'

'কেন বল দেখি ?'

গণেশ অল্পকাল চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'আপনি শালা বদু বোসের লোক ন'ন ত ?'

'—আরে না-না !'

'পটাশদাকে ধরিয়ে দেবার জন্য বদুশালা পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে।'

'সেকি। পটাশত শুনেছি বদুবাবুর দলের ছেলে।'

'কোন্ শালা বলে ? আমরা কারো কেনা গোলাম নই ! বাপের রোজগারে সংসার চলে না, দিনভর পেটে ছুঁচো ডন মারে। তাই পয়সা নিই ভোটে খাটি পোস্টার ছিটাই—'

খুব দ্রুত বলে গেল গণেশ। যেন শেখানো বুলি মুখস্ত বলছে। স্বরগ্রামের কোনো ওঠা-নামা নেই। মুখটাও ঠাণ্ডা, রেখাবিহীন, শক্ত। এ মুখের দিকে একদৃষ্টে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে শরীরের স্নায়ুকোষে কেমন যেন একটা শীতল শিরশিরানি জাগে। মনে হয়, এই ছেলেটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে ছুরি বসিয়ে মানুষ খুন করতে পারে। এই সতেরো বছর বয়সেই।

গণেশের সঙ্গে কথা বলতে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। কেমন যেন রুচিতে বাধছিল, ভয় ভয় করছিল। ওর মধ্যে সভ্যতা ভব্যতার লেশমাত্র নেই। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি, সমস্তই অতিশয় কদর্য। পটাশের পেটে কিছু কলেজের বিদ্যে আছে। এটা মনে হয় একেবারে গোমুর্খ। ও কি করে গীটারে সুর তোলে !

বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি যাও গণেশ।'

গণেশ যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'পটাশদার কোনো দোষ নেই। যত দোষ ওই বদে শালার। ওই-ই পটাশদাকে ডেকে অপমান করেছে। বাপ তুলে খিস্তি দিয়েছে। আমি শুনেছি। পটাশদা তাই মাঝরাতে বড় খোক ঝেড়ে দিয়েছে দু'খানা—'

'বড়খোকা কি ?'

'জানেনা না ? ছ্ছোঁও। এই যে এই সাইজ—'

ডানহাতের পাঁচ আঙুলের মুদ্রায় একটা গোলাকার বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তুলল গণেশ। একটু হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে বলল, 'আমিও ঝাড়ব একদিন শালার টাকে। শালা খচ্চর দি গ্রেট ! ভোটের আগে এবার পাকা কথা হল—হারুক জিতুক ওর এলুমিনিয়ম কারখানায় আমাদের দুজনের চাকরি দেবে। এখন বলে

কিনা, কাজ কই, চাদ্দিকে ছাঁটাই চলছে, কারখানাই না উঠে যায়। শালা চারশ বিশ। হালে বুকনি ঝাড়ছে, গদি গিয়ে আমার আয় কমে গেছে। বস্তির ঘরভাড়া বাড়াতে হবে। একলাফে শালা দুনো—'

বলতে বলতে হঠাৎ-ই থেমে পড়ল গণেশ। ওর শক্ত জমাট মুখ পূর্ববৎ নির্বিকার। হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা শুধু চোখের মণিতে ঝিকচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে বলল, 'পটাশদা এলে আপনার কাছে আসতে বলব। আপনি খুব ভালো লোক। ওর ভাইকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন! আমি এখন যাচ্ছি।'

গণেশ চলে গেল। আমি নিঃশব্দে ওর যাওয়া দেখলাম। ঘর খালি, তবু মনে হল গণেশের নিরুত্তাপ শীতল উপস্থিতি প্রবলভাবে অনুরণিত হচ্ছে। কি যেন একটা আছে ওর মধ্যে। সেটা জমাট বাঁধা হতাশা অথবা ঘনীভূত হিংস্রতা। কিংবা দুয়েরই মিশ্রণজাত একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কিছু—বুঝে উঠতে পারলাম না। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ এই ছেলেটিকে ভীষণভাবে ঘৃণা করতে গিয়েও হঠাৎ মনে হল, পটাশের বদলে ওকেই যদি নায়ক করি, কেমন হয়? আমি মনে মনে প্লটটাকে আবার নতুন করে সাজাতে বসলাম।

না, সম্পাদক মশাই, ওদের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই, সমর্থন ত নয়ই। আমি ওদের উৎস খুঁজতে চাই না, ছুঁতে চাই না হতাশার বেদনাকে, শুধু ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে দেখা, কিছু অনভ্যস্ত চালচলন ও ভাষা শিখে নেওয়া, আর তারই পটভূমিতে গড়ে তোলা একটি সুরম্য রচনা। যার নায়ক হবে পটাশ কিংবা গণেশ, নায়িকা দক্ষিণের ওই হলুদ জানালা। সেই পুরানো প্রেম-প্রেম খেলা, শরীরের উত্তাপ ছড়ানো! তার বেশি আর কিছু ইচ্ছে নেই আমার। ক্ষমতাও নেই, কেন না ওরা যা, আমি তা নই। ওদের সঙ্গে আমার পার্থক্য দুস্তর। আমি কি পারি ওদের আঁতের কথা টেনে বার করতে!

গল্প লেখার কাজ শুরু হয়ে গেল। এগিয়েও চলল তরতর করে। এমন সময় হঠাৎ এক রাত্রে পটাশ এসে হাজির। চুল এলোমেলো, মুখ শুকনো, ডান গালের কালো আঁচিলটা গভীর ক্ষতের মতো দগদগে। ঢুকেই আবার দরজা বন্ধ করে দিল ও। কোণের দিকে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। ওর বাঁ হাতের দুটো আঙুল জড়িয়ে বড়ো একটা ব্যাণ্ডেজ নজরে এল।

'হাতে কি হল তোমার?' আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

'ও কিছু না।' পটাশ স্বভাবমতো কাঁধ ঝাঁকাল।

'কিছু না কি! অনেকটাই জখম হয়েছে মনে হচ্ছে?'

'সামান্য।'

'কি করে হল?'

'ইয়ে, মানে একটা বোমার সুতো জড়াতে গিয়ে…'

'তুমি নিজের হাতে বোমা বানাও?'

'বানাই। এক নম্বরী মাল হলে আমাকেই বাঁধতে হয়। আর কেউ পারে না।'

'গণেশ?'

'ও ত ছেলেমানুষ! এখন পর্যন্ত মশলা মাখতেই শিখল না।'

'তুমি বড়ুবাবুর বাড়িতে বোমা ছুঁড়েছিলে?'

'আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'গণেশ বলেছে।'

'ছুঁড়েছিলাম। সেদিন বলিনি স্যর আপনাকে, শালা হাড়ে হাড়ে বেইমান! বস্তি থেকে এখন আমাদের উঠিয়ে দিতে চায়।'

'তোমরা উঠে যাবে?'

'এক শালাও না! এইখানেই থাকব। ওই হারামির বুকের ওপর। হিম্মৎ থাকে ওঠাক দেখি কাউকে—'

'তোমার বাবা বুড়ো মানুষ, সামান্য চাকরি করেন…'

পটাশ ঠোঁট কামড়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'আমি আছি কি করতে! সেদিন দুটো ঝেড়ে এসেছি, আবার ক'টা ঝাড়লেই বড়ুবাবুর সাতগুষ্টি বরফ বনে যাবে!'

আমি প্রসঙ্গ পালটে নিজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখলাম, 'তোমরা বোমা কি দিয়ে তৈরি কর? মালমশলা কোথায় পাও?'

পটাশ অবাক হয়ে গেল, 'আপনি জেনে কি করবেন?'

'কাজ আছে। বল না—'

পটাশ চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে ক্রূর সন্দেহ। চোয়াল দুটো কঠিন। মনে হল আমাকে পুলিশের লোক ভাবছে। ইন্‌ফর্মার। অথচ ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছে না। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বাঁ হাতটা তুলে আস্তে আস্তে গালে বুলোচ্ছে।

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাকে বলতেই হল, 'একটা গল্প লিখছি, তাতে দরকার হবে।'

'আমাদের নিয়ে গপ্‌পো?'

'হ্যাঁ!'

'তাই বলুন!' খুশি হয়ে হেসে ফেলল পটাশ, 'স্যর, সিনেমা হবে? আপনজনের মতো?'

'এখনই কি বলা যায়! আগে লিখি—'

'লিখুন স্যর! বোমা তৈরির সব রকম ফর্মুলা আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি!'

'আস্তে বল টুকে নিই।'

মিনিট পাঁচেক পার না হতেই বাইরে দ্রুত পদশব্দ। পরমুহূর্তে দরজায় অস্থির করাঘাতের সঙ্গে চাপা গলা, 'পটাশদা জল্‌দি কাট্ মারো। খটাসের বাচ্চা গলিতে ঢুকেছে!'

শুনে মুখের হাসি-হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল পটাশের। চোখ মুখ কঠিন ধারালো হয়ে গেল। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ও; 'চলি স্যর, পুলিশ এসে গেছে।'

তারপর আমাকে কিছু বলার বা বোঝার সুযোগমাত্র না দিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল। যে ওকে ডাকতে এসেছিল, মনে হল গণেশ। পলকের মধ্যে দুজনেই দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার তখুনি মনে পড়ল, পটাশ এখন ফেরারী আসামী ওকে ধরার জন্য পুলিশ জাল পেতে রয়েছে। স্বয়ং বঙ্কুবাবু রিপোর্ট করেছেন ওর নামে। রাষ্ট্রপতির শাসনে বঙ্কুবাবুদের লুপ্ত ক্ষমতা আবার ফিরে এসেছে। পুলিশ আবার ওদের আজ্ঞাবাহী। তখনই আমার কেমন জানি ভয় হল। জেনেশুনে শত্রুকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছি, বঙ্কুবাবু যদি টের পায়, আমার ক্ষতি হবে। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব আছে! আর না, যথেষ্ট হয়েছে। বাঙলা দেশের পাঠকের জন্যে গল্প লিখতে হলে এর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা বা স্টাডির দরকার হয় না। এইটুকুই বা কজনে করে! এ বাড়িতে আর ঢুকতে দেব না ওদের। আর কোনো কথাবার্তাও না। আগের মতোই ওরা ফিরে যাক ওদের স্বস্থানে, আমি উঠে আসি আমার জায়গায়। মাঝখানে সেই পুরনো উপেক্ষার প্রাচীর আবার দাঁড়িয়ে থাক।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে দরজা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গেলাম। আর তখুনি

আমার ঘরের কাছেই কোথাও পরপর তুটো বোমা ফাটল ; প্রচণ্ড শব্দে পাড়া কেঁপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু চিৎকার, হই-হল্লা, ছুটোছুটি, ভারি বুটজুতোর শব্দ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আবার একটা বিস্ফোরণ! বুঝলাম, সামনের গলিতে গণেশ-পটাশদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

আমি সভয়ে দরজা বন্ধ করলাম। আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে স্ত্রী আর নীলা। ওদের মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ। আমি স্ত্রীকে রাস্তার দিকের জানালাটাও বন্ধ করতে বললাম।

আজ বোধহয় পটাশ ধরা পড়ে যাবে। পুলিশ মনে হয় চারদিক বেঁধে নেমেছে। কাঁদানে গ্যাসের শেল্ ছোঁড়ার শব্দ পাচ্ছি। বাতাসে ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে।

না, পটাশের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলাম না আমি। বদ্রুবাবুকে চটানো ওর উচিত হয়নি। যে ডালে বাসা সেই ডালে কি দা বসায় কেউ! এদ্দিন পুলিশের ঝুটঝামেলা থেকে বদ্রুবাবুই ত বাঁচিয়ে এসেছে ওদের। এখন ওরা আশ্রয়চ্যুত, কে বাঁচাবে?

অন্ধকার গলিঘুঁজিতে গা ঢাকা দিয়ে ওরা কি ভাবে পুলিশের আক্রমণ ঠেকায়—দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে সাহস আমার নেই। পটকার শব্দে আমার বুক লাফায়। আমি বরং খেতে যাচ্ছি। নীলার মা ভাত বাড়তে চলে গেছে।

পটাশরা মরুক বাঁচুক, আমার কি এসে যায় তাতে! আমার কাছে ওদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অভিজ্ঞতায় যেটুকু ফাঁক আছে কল্পনায় তা পূরণ হবে। সাহিত্য ত বাস্তবের ফটোগ্রাফ নয়।

সম্পাদক মশাই, এতক্ষণ যা লিখলাম, ঘটনা যদি এখানে এসেই থেমে যেত তাহলে আপনার কাছে সবিস্তারে কৈফিয়ত ফেঁদে গল্প না-দেওয়ার জন্য মার্জনা চাইতে হত না। বরং এরপর যা ঘটল তাকে বলা যেতে পারে অত্যাশ্চর্য, অকল্পনীয়। ঘটনার আকস্মিকতায় আমার সমস্ত বুদ্ধি লোপ পেল। এই সমাজে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন-কানুন সম্পর্কে সমস্ত মূল্যবোধ আমূল পালটে গেল। আমার শ্রেণী থেকে, স্পর্শকাতর অহমিকা থেকে, নির্বুদ্ধিতার স্বর্গ থেকে কে যেন আমাকে চুলের ঝুঁটি ধরে এক হেঁচকা টানে সমতল ভূমিতে নামিয়ে আনল আমি আহত, বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখলাম, এখন, এখানে, এই দেশে, পটাশ এবং আমি একই খাঁচার অধিবাসী—শুধু বৈদ্যনাথ বসুদের গোত্র আলাদা।

হ্যাঁ সম্পাদক মশাই, পুলিশ এল। আমারই ঘরে।

কৃষ্ণবর্ণ, নাতিদীর্ঘ, স্থূলোদর একজন—মনে হল উচ্চপদের কেউ।

তৎপশ্চাতে তিনজন মারমুখী সিপাই। অফিসারটি ঘরে পা দিয়েই কর্কশ গলায় হেঁকে উঠল, 'আপনার ঘরে পটাশ ওরফে পূর্ণেন্দু এসেছিল। কোথায় সে?'

পুলিশ দেখেই আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। গলা শুনে রক্ত হিম হয়ে এল। কোনো গতিকে বললাম, 'সে ত চলে গেছে। অনেকক্ষণ—'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না।'

'কোথায় থাকে সে?

'জানি না।'

'ইউ লায়ার—'

প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল অফিসার। সিপাইগুলো ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। আমার হিমশীতল রক্তে চনমনে জ্বালা দেখা দিল। 'লায়ার' শব্দটা প্রচণ্ড একটা হাতুড়ির মতো আমার হৃৎপিণ্ডে ধাক্কা মারল। আমি সোজাসুজি তাকাতেই অফিসারটির জান্তব মুখ, কোমরের বেল্টে লম্বমান রিভলবার দেখলাম। দরজার ওপাশে ভয়ার্ত নির্বাক নীলার মাকে দেখলাম, পাশে নীলাকে।

'আপনি সব জানেন! কিছুদিন থেকেই আপনার এখানে ওদের আড্ডা।'

'না, মিথ্যে কথা।' আমি ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করলাম, 'কে বলেছে এসব?'

'আমরা জানি!'

আরো ক'পা এগিয়ে এল লোকটা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক জরিপ করল। তারপর সামান্য ঝুঁকে টেবিলের বইখাতা দেখতে দেখতে হঠাৎ খোলা ডাইরিটা হাতে তুলে নিয়েই যেন ফাঁদে বাঘ ধরার আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাই গড্! এসব কি? পটাসিয়াম, এক ধরনের গুঁড়ো পদার্থ, রঙ হলুদ। নাইট্রিক এসিড, রঙ শাদাটে। কড়াই ভাঙা, কাচের টুকরো, পেরেক, পিকরিক এসিড এ সব ত বোমা তৈরির ফর্মূলা!'

'হাঁ!'

'কি সাংঘাতিক! শালা কুত্তার বাচ্চা! চলো থানায়। এই ভগৎ সিং...'

সম্পাদক মশাই, তারপরের ঘটনা আমি বিস্তারিত বলতে পারব না। আর তার দরকারই বা কি। সব শুনলে আপনি নিশ্চয়ই কষ্ট পাবেন। আপনার মনকে আমি অযথা পীড়িত করতে চাই না। খুব সংক্ষেপে শুধু দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করি।

ওরা একরকম আমার জামার কলার ধরে টানতে টানতে গাড়িতে তুলেছিল। সেখানে আরো একজন ছিল। সে গণেশ। তার জ্ঞান ছিল না। মাথা দিয়ে রক্তের ধারা চোখে মুখে আসছিল। একটা ভারি বুটজুতো ওর বুকের উপর চেপে বসেছিল। আমি গণেশের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। গাড়ি চলতে শুরু করল। গণেশের সঙ্গে একই অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে আমি থানায় এলাম। আমার একটা কথাও কেউ শুনল না।

না, আমার ওপর তেমন মারধোর হল না। সম্ভবত অধ্যাপক বলে খাতির করল! সেই অফিসারটি তলপেটে শুধু একটুখানি গুঁতো মেরে বলল, 'এখন তোমরা শালা তিলে খচ্চর বনে গেছ! কলেজগুলোতে বোমা তৈরির কারখানা বানাচ্ছ। পেঁদিয়ে সব লাশ করে দেব!'

একজন সিপাই হঠাৎ ঘরে ঢুকে, 'আরে এ চোট্টা ত বহুত বাবু হ্যায়' বলে গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে মাথায় একটু লাঠির খোঁচা মেরে গেল।

তার রসিকতায় খুশি হয়ে অফিসারটি হাসতে হাসতে বলল, 'ধানাই পানাই ছেড়ে এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো বল ত ওস্তাদ, এসব বোমা তৈরির ফর্মুলা খাতায় কেন লিখে রেখেছ?'

অনেকক্ষণ পরে গণেশের যখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরল, থানার মেঝেয় উঠে বসল ও। আমাকে দেখতে পেয়েই মুখ কালো করে বলে উঠল, 'আপনি এখানে কেন? ওই শুয়োরের বাচ্চারা আপনাকেও ধরে এনেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে একটা লাথি পড়ল ওর মুখে। গণেশ আবার গড়িয়ে পড়ল।

সম্পাদক মশাই, গণেশের মতো একটা রুচিহীন, মূর্খ মস্তানের জন্য এই প্রথম আমার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। এই থানার চার দেয়ালের কদর্য বাতাসের মধ্যে ওকে আমার আপনজন বলে বোধ হল। ওর জন্য আমার চোখের পাতা ভারি হয়ে এল।

শিয়ালদ'র ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কোর্ট-ইন্সপেক্টর সদর্পে তেজীয়ান গলায় বলে গেল, 'ইওর অনার, এই লোকটি পেশায় অধ্যাপক হলে কি হবে, স্বভাবে একজন সাংঘাতিক হিংস্র লোক। পাড়ার সমস্ত অ্যান্টিসোশ্যাল এলিমেণ্টের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তার প্রমাণ ওর নিজের ডাইরি থেকেই পাওয়া যায়। ওখানে পটাশ ও গণেশের নাম আছে। ওরা দু'জনেই পাড়ার নামকরা গুণ্ডা, দাগী আসামী। ইওর অনার, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস গত ১৮ই এপ্রিল, রাত্রি একটায়, পাড়ার বিখ্যাত সমাজসেবী, আইনসভার

প্রাক্তন সদস্য, ক্যালকাটা এলুমিনিয়ম কোম্পানীর মালিক শ্রীযুক্ত বৈদনাথ বসুর গৃহে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে অতি মারাত্মক ধরনের যে দুটি বোমা পটাশ ওরফে পূর্ণেন্দু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়েছিল—সেই জঘন্য চক্রান্তের সঙ্গে এই লোকটিও জড়িত।'

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'এ-ব্যাপারে ওঁর কি স্বার্থ আছে?'

কোর্ট ইন্‌সপেক্টর বলল, 'এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তদন্ত চলছে। তবে আমার দৃঢ় ধারণা, এই লোকটিই পাড়ার ছেলেদের বোমা তৈরি করতে শেখায়। কলেজ ল্যাবরেটরি থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে আনে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এর যোগাযোগ থাকতে পারে। কারণ এর পড়ার টেবিলে ম্যাক্সিম গর্কির দুখানা উপন্যাস, একটা গল্পসংকলন পাওয়া গেছে গেছে। ম্যাক্সিম গর্কি একজন কমিউনিস্ট লেখক। লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল…'

ম্যাজিস্ট্রেট আবার বাধা দিলেন, 'ওঁর বাড়িতে কি বোমা তৈরির মালমশলা পাওয়া গেছে?'

ইন্‌সপেক্টর ঘাড় নাড়ল, 'না, ইওর অনার। ওঁর বাড়ি সার্চ করা হয়নি। তবে সাংঘাতিক ধরনের এই ছুরিটা ঘটনার দিন ওঁর টেবিলে পাওয়া গেছে—'

একটি কাগজ-কাটা ছুরি এক্সজিবিট নং ২ হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলে রাখা হল। আকারে ছুরিটা কিছু বড়ই। বহু ব্যবহারে মলিন ও ভোঁতা হয়ে আসায় কিছুদিন হল শান দেওয়া হয়েছে। এখন ওটা চকচক করছে। ম্যাজিস্ট্রেট খুব গম্ভীর মুখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছুরিটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। কোর্ট-ইন্‌সপেক্টর বলে চলল, 'এই আসামীর জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর করা হোক, ইওর অনার। কারণ শিক্ষা-দীক্ষা ও ভদ্রপোশাকের অন্তরালে এরা আসলে সাংঘাতিক জীব। সমাজের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু…'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ছুরিটা ফেরত দিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। তার কি অর্থ বোঝা গেল না। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার তখন আর ভয় করছিল না, এমন কি লজ্জা না, অপমান না, এতটুকু সঙ্কোচ না। আমার শুধু প্রবল অট্টহাস্যে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আদালত অবমাননার ভয়ে আমি হাসতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

আরো তদন্ত সাপেক্ষে মামলা বিচারাধীন থাকল। জামিন মঞ্জুর হল আমার। বাসায় ফিরে এলাম। তার একটু পরেই পলাশ এল।

'স্যর।'

'বল।'

'আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটাখানেক পরেই দাদা বাড়ি এসেছিল।'

'কে, পটাশ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'দাদা বলেছে,' ওর জন্যে আপনার যেন কোনো ঝামেলা না হয়। দরকার হলে ও থানায় সারেণ্ডার করবে...'

থানার কথা বলতেই আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। সেই অফিসারটির কথা মনে পড়ল। গণেশের রক্তাক্ত মুখ চোখে ভাসল। আর আহত মুখের ওপর সেই অমানুষিক লাথিটার কথা মনে পড়ল। তারপর আদালত। ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট-ইন্‌সপেক্টর, এক্সিবিট নাম্বার টু, রাষ্ট্রের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু··পটাশ কি এসব জানে না? নিশ্চয়ই জানে। জেনেশুনেও শুধু আমারই জন্যে সারেণ্ডার করবে পটাশ? আশ্চর্য! কাল রাত্রেই না আমি ওদের আমার অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ভেবেছিলাম!

বললাম, 'না। কখনোই যেন ও থানায় না যায়। আমার ঝামেলা আমিই কাটিয়ে উঠতে পারব। পটাশ গা ঢাকা দিয়ে থাকুক—'

হ্যাঁ, সম্পাদক মশাই, আমিই এই বুদ্ধি দিলাম। গণতন্ত্র রক্ষা বড় কঠিন কাজ! সমাজহিতৈষী বৈদ্যনাথবাবুদের আক্রমণ বড় ভয়ানক। তার জন্য পুলিশ চতুর্দিকে জাল পেতে রেখেছে। ধরতে পারলেই গণেশের মতো টেনে তুলবে হাজতে। ওরা ত জন্ম থেকেই পীড়িত, সাধ করে আর পীড়ন ডেকে আনার দরকার কি। তার চেয়ে আত্মরক্ষার জন্য যা করণীয় তা-ই করুক। দরকার হলে আরো বোমা বানাক, আরো বোমা ছুঁড়ুক।

সম্পাদক মশাই, মস্তানদের নিয়ে যে লেখা শুরু করেছিলাম, তা ছিঁড়ে ফেলেছি। মামলা-টামলা মিটে গেলে আবার লিখব। তবে শুরুতে যেমন ভেবেছিলাম তেমন না। সে সব গল্প বাজারের ভাড়াটে লেখকেরা লিখুক। আমার পরগত অভিজ্ঞতা আত্মগত উপলব্ধিতে পৌচেছে। জীবনে নিজের হাতে বোমা হয়ত কোনোদিন বানাতে পারব না, কিন্তু গণেশ-পটাশদের গল্পের মধ্যে বোমার বিস্ফোরক আমি ভরে দেব!

পারমাণবিক চুক্তি
এবং নীলাদ্রির কোলকাতায় বুদ্ধ-পূর্ণিমা

সুনীল দাশ

অন্ধকারে একটা মৃতদেহের ওপর পা পড়ার সংগে সংগে নীলাদ্রি পায়ের পাতা সরিয়ে নিল। দেহটা এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। রক্ত জমে আছে চারপাশে। চটির তলায় এবং নীলাদ্রির পায়ের পাতার ওপর কয়েকটি আঙুলে রক্ত লেগে গেল সম্ভবত। সে আরো খানিকটা দেওয়াল ঘেঁষে এলো। অন্ধকারে আরো মিশে গেল। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখের ওপর অন্ধকার হালকা করে নিল। দেখল, একটু একটু করে চারপাশটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। খানিক আগে সংবাদপত্রের অফিস থেকে বেরিয়ে মনের তলায় একটা কিচারের কাঠামো গড়তে গড়তে এদিকটায় সে এসেছিল, ইচ্ছা ছিল বাড়ি ফেরার আগে কৃষ্ণাদের ওখানে যাবে একবার। বাড়ি ফিরে প্রতিদিনের মতন একটা স্নিগ্ধ স্নান সেরে লেখা নিয়ে বসবে! যা কিছু কুৎসিত, যা কিছু অস্থির সব সরিয়ে ফেলে এক অনন্তপূর্ণের দিকে তার মন ফিরিয়ে নেবে। পূর্ণ চাঁদের আলোর কোমলতায়, নরম রঙের মতন শব্দগুলো সাজিয়ে যাবে। এইসব ভাবতে ভাবতে, সে বড় রাস্তা ছেড়ে, ছোট রাস্তার পেভমেন্ট দিয়ে এগোচ্ছিল। পথের দুপাশে যারা পাকা বাড়ির গা-ঘেঁষে সংসার বিছিয়েছে, তাদের গায়ে যাতে পা না পড়ে সেজন্য তাকে বারবার নেমে আসতে হচ্ছিল। গাড়ি সারানোর পুরনো কারখানাটার সামনে আসতেই দেখল একটা গোলমাল শুরু হয়েছে। নিমেষে আলো নিবে গেল। নীলাদ্রি ভাঙা গেটটা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল কারখানাটার ভেতরে।

এখন, ভাঙা মোটরটার পাশ থেকে মুখ বার করে সে ভাল ক'রে দেখে নিল, মৃতের সংখ্যা এক নয়, তিন এবং চতুর্থটি আরো কিছু সময় জীবিত থাকবে বলে মনে হয়। নীলাদ্রি চতুর্থ দেহটির থেকে গোঙানির শব্দ শুনতে পায়, অন্ধকারে বুক ঘষে দেহটা নড়ে উঠতে চায় দু একবার। গোঙানিটা শুনে নীলাদ্রির

ভেতরটা কীরকম যেন শিথিল হয়ে আসে। পাছে শব্দ হয় তাই বড় করে নিশ্বাস নামাতে পারে না বুক থেকে। ভাঙা মোটর এবং মধ্যবর্তী দেওয়ালের ফাঁকটুকুতে পুরনো ময়লার মতন এঁটে থাকার চেষ্টা করে। যে কোন মুহূর্তে চোখে পড়লে তার শরীরটাও মৃতদেহের সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে শুধু।

আজ না বুদ্ধ পূর্ণিমা। চাঁদ ওঠেনি কেন! আকাশে কি খুব মেঘ করেছে? যারা খানিক আগে এখান থেকে একটা জখম ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, তারা কি আবার ফিরে আসবে? কটা বাজল এখন? পুলিশ কি এধারটায় আসবে? রাস্তায় রক্তের দাগ পড়েনি? —তার মাথার মধ্যে প্রশ্নগুলো জড়াজড়ি করে, ঠেলাঠেলি করে, শরীরের ভেতরে বাইরে একটা গুমোট ভাব হাঁসফাঁস করে অনবরত।

যে ছেলেটাকে ওরা ধরাধরি করে নিয়ে গেল, সে বেঁচে যাবে হয়তো। গুলিটা তার কাঁধে লেগেছে। তাই ওরা ওকে নিয়ে গেল। কিন্তু এই ছেলেটার বাঁচার কোন আশা নেই। দুতিনটে গুলি পাজরা ফুটো করে দিয়েছে। অল্প কিছু সময় পরে এখানেই ও ঠাণ্ডা হতে শুরু করে দেবে। তখন, খানিক আগেও বেঁচে ওঠার জন্যে ছেলেটা বড় করুণ ভাবে ডাকছিল। দলের অন্য একটি লোকের বাঁ পায়ের কাছে লুটিয়ে বলেছিল—'আমায় নিয়ে চল নিতুদা, গুলি দুটো বার করে নিলে আমি ঠিক বেঁচে যাবো। আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমায় ফেলে রেখে যেও না।' নীলাদ্রির বুকের বাতাস ভারি হয়ে আসছিল। বুকের মধ্যে গুলি লাগার পরও মানুষ এভাবে কথা বলে কী করে। অন্ধকারে দম চেপে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি ছেলেটির দলের দু একজন যুবকের কথা বুঝতে পারছিল। তাদের কণ্ঠস্বরে খানিকটা দুর্বলতার আভাস ফুটে উঠেছে।

'নিতুদা চলো, নন্তুকে নিয়ে যাই; বলা যায় না, শমুর মতন বেঁচে যেতে পারে।'

'শক্ত হতে শেখ পরি, এখন একটা সেকেণ্ড নষ্ট করা মানে সবাই মরা।' ওদের নিতুদার কণ্ঠস্বরে কোন দুর্বলতার আভাস পর্যন্ত নেই।

'তোমরা শ্যামলকে নিয়ে যাও, আমি নন্তুকে ঠিক নিয়ে যাবো।'

'পরি এখন দুর্বল হওয়ার সময় নয়।' চাপা এবং কঠোর কণ্ঠস্বর, আদেশের মতন।

তারপর কি হলো?

পরি কি একবার অন্ধকারে নন্তুর রক্তে-ভাসা দেহটার দিকে তাকাল?

তখনো নন্তুর জ্ঞান ছিল পুরোপুরি ? নীলাদ্রি শুধু শুনল কতকগুলি পায়ের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর পেরল আরো খানিকটা সময়। কাতরাতে কাতরাতে নন্তু ক্রমশ স্থির হয়ে আসছে। মরে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে কি ভাবছে নন্তু? গলার স্বর শুনে মনে হয় বয়স বেশি নয়। সতের আঠার হবে হয়তো। তার ভাই রঞ্জনের বয়স। এই মুহূর্তে আঠার বছরের দেখা পৃথিবীটাকে কি মনে হ'চ্ছে ওর? ঘেন্না, ঘেন্না। এই চারপাশ, তার চারিপাশে সতের-আঠার বছর জুড়ে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষদের জন্যে, সমস্ত অনুভব ছাপিয়ে ঘেন্না করা ছাড়া, দারুণভাবে তীব্র ঘৃণা করা ছাড়া আর কোন দৃষ্টি সঞ্চয় হয়েছে তার ? এ মাটিতে ঠিক মতন কেউ কি আর পা রাখতে পারে ? এ বাতাসে বিষ টেনে বেঁচে থাকার মতন এক নিদারুণ জ্বালায় ফিরে আসতে ইচ্ছে করে কার ? তবে কেন নন্তু আর একবার বেঁচে উঠতে চাইল।

আজ না বুদ্ধ পূর্ণিমা। আজ চাঁদ ওঠেনি কেন ?

নীলাদ্রির বড় ইচ্ছে করছিল নন্তুর মুখটা দেখতে। কোন্ পৃথিবীতে তুই বেঁচে উঠতে চাসরে নন্তু! তোর পৃথিবীটাকে তুই তো এখনো খুঁজে পাসনি। জীবনের শেষ সময়টুকু যখন শিয়রে এসে দাঁড়ায় তখন কি ভীষণ ভাবে বেঁচে থাকাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে ? নষ্ট কাঠামোকে বদল করবার সাধে আরো একবার জীবনে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে! পুরোনো গাড়ি সারানোর কারখানাটার অন্ধকারে মৃত আর প্রায়মৃত মানুষদের পাশাপাশি নীলাদ্রি— একজন জীবিত মানুষ, সারাক্ষণ নিজের অসহায়তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সারাক্ষণ নিজের বেঁচে থাকাকে প্রাণপণ চেষ্টায় লুকিয়ে রাখে ; নিমেষ গোনে, কান পেতে থাকে অন্য কারো পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। সেই ভারি বাতাস, সেই নিরালোক চারপাশ, শিয়রে মরণ এলে কিশোরের কণ্ঠস্বর, একটু একটু করে, চুঁয়ে চুঁয়ে তার রক্তের মধ্যে মিশতে থাকে যেন। গুলির শব্দ, বারুদের গন্ধ, গেট পেরিয়ে পায়ের পাতায় লাগা রক্তের ছোঁয়া, অনু, পল, দণ্ড, সময়, ভেঙে ভেঙে, গ'লে গ'লে তার অনুভবে একাকার হ'য়ে আসে। শহর কোলকাতা সময়ের অন্য পারে ফিরে যায়। নববাবুবিলাস পেরিয়ে পল্লী সুতানটি, তা ছাড়িয়ে আরো দূর মনসার ভাসানে। সম্ভবত ভুলে দেখতে হয় একদা সে কোন এক বয়সে এঙ্গেলস্ পড়ে বিমুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মনে পড়েনা কি এক সময়ে সাধ ছিল চে'র জীবনায়নে এক কাব্যনাট্য লিখি। ভুলে যেতে হয় নিজের কণ্ঠস্বর ; আমাদের রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে নিবিড় হয়ে

আছেন তাঁর ইতিহাস চেতনায় ; কালের যাত্রাপথ চিহ্নিত করতে করতে ঠাকুর বাড়ির নীল রক্তের যে মানুষ খোয়াইয়ের পাড়ে এসে কালান্তর বিশ্লেষণ করে নিথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে নীলাদ্রির বুকের তলায় নস্টালজিয়া শিরশির করে ওঠে।

"প্রাকৃতিক নিয়মের স্বাধীনতার স্বপ্নের মধ্যে মুক্তি গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে এই নিয়মের জ্ঞানের ওপর। সম্ভাবনার মধ্যে এই জ্ঞান যথাযথ কাজ করে একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।" এখন কি তার ভাবার সময় আছে যে এঙ্গেলস তো আজও তার প্রিয় লেখকদের একজন! তবে চারপাশ এমন শিথিল হয়ে আসে কেন? দু হাত দূরে এ আঠারো বছরের বেঁচে থাকা ওই রক্তে কার ঋণ মিটিয়ে দিতে চায়? চটি পেরিয়ে নীলাদ্রির পায়ের পাতায় রক্ত শুকোয় আর টানটান হ'য়ে ভীষণ সতর্কতায় অন্ধকারে মিশে যেতে যেতে আঠাশ বছরটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে যেতে চায়।

কে বলবে আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা! ওপাশের কালো আকাশটা ক্রমে লাতিন আমেরিকার রিলিফ ম্যাপ হ'য়ে উঠছে। বড় গুমোট। হাঁপ ধরে আসে। পুরনো এই বন্ধ কারখানার আনাচে কানাচে সাপখোপ নেই তো!

আবার এক সংগে অনেকগুলো পায়ের দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল। নীলাদ্রি শরীরটাকে আরো টানটান করে নেয়, আরো ঘন করে অন্ধকারে মিশে থাকে।

একী! একজনের হাতে যে একটা টর্চ। আলোটা এসে পড়ছে এখানে—সেখানে। একটু উঁচু করে কোনাকুনি ধরলেই নীলাদ্রির মুখে এসে পড়বে সরাসরি। তারপর? তারপরই জনাকয়েক ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। টেনেহিঁচড়ে মেঝেতে ফেলবে কিংবা ফেলার আগেই বুকে, পিঠে, তলপেটে কিংবা কণ্ঠনালীতে ধারালো অস্ত্রটা বারকয়েক টেনে দেবে। আর তখন, মৃত্যুর সেই পূর্ব মুহূর্তটিতে নস্তর মস্তন নীলাদ্রিরও তখন বাঁচার ইচ্ছাটা তীব্র হ'য়ে উঠবে। উঠে দাঁড়াতে চাইবে। অতর্কিত তার গগন ঠাকুরের আঁকা একটা ছবি মনে এলো কেন? একটা কালো ঘোড়ার পিঠে একজন রাজপুরুষ—সারা অঙ্গ কালো পোশাকে ঢেকে এগিয়ে চলেছে।

'এখানে কটা লাস প'ড়ে?'

'চারটে মোট।'

'আর গুলো?'

সে-সবগুলো জখম ছিল, বোদয় শালারা পাচার দিয়েচে।'

'ভাল করে দেকে নে, আমাদের কেউ নেই তো।'

'নাহ্। আমাদের মোট তুটোই—আর নেই।'

'অ্যাই। ওই লাসটা লড়চে মনে হচ্চেনা!'

'এখনো শালা খতম হয়নি।'

'সেঁটে দে।'

একজন এগিয়ে গেল নন্তুর দিকে। কিন্তু তার আগেই বাইরে বোমার আওয়াজ, ফায়ারিং এর শব্দ। টর্চের আলোটা নিবে গেল। নীলাদ্রির পায়ের পাতার অল্প খানিকটা দূর দিয়ে আলোর বৃত্তটা ঘুরে গেল। পায়ের তলা থেকে একটা কাঁপন শিরশির করে তার মাথার দিকে ছুটে গেল। চারপাশ আবার চুপ। ওরা সবাই দ্রুত ফিরে যাচ্ছে। যেতে যেতে ওদের মধ্যে একজন বলল, কি অন্ধকাররে বাবা। আজ কি আমাবস্যে!'

'তাই হবে। অন্যদিন তো এমনি থাকে না।' ওরা চলে গেল।

ওরা চলে যাবার পর নন্তু আরো একবার গোঙালো। বুক ঘষে এগোলো আর একহাত। ওরা কেউ কিচ্ছু জানেনা, রাতটাকে ওরা অমাবস্যা বলছে! অথচ আজ পূর্ণিমা। হে অনন্তপূর্ণ। নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী। কপিলাবস্তুর সেই পূর্ণিমায় কি চাঁদ উঠেছিল গগনে! একটা বড় চাঁদ। আকাশ ভাসানো আলোয় কি পূর্ণ চাঁদের মায়া ছিল?

নন্তু হয়তো চোখ মেলে এই আঁধারে শেষবারের মতন চার পাশটা দেখে নিচ্ছে। নন্তু, চারপাশটাকে তুই না বদল করতে চেয়েছিলি? কে কাকে বদল করবে! মানুষ না মানুষের চারপাশ?

"দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর উপনিবেশের দেশগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। সেখানকার বণিকশ্রেণীর সহযোগিতায় শিল্পায়নের নামে ভাগ্যপণ্য আমদানী করার ব্যবস্থা পালটান হলো। এলো শিল্পায়ন নীতির আড়ালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাড়তি মূলধনের আয়োজন। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নেমেছিল যেসব ইউরোপীয় দেশ—তাদের তুলনায় পরোক্ষ ভাবে লিপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি এগিয়ে চলেছে।

নতুন আন্তর্জাতিক আর্থিক-নীতি অনুসারে অনুন্নত দেশগুলোকে সাহায্যের নামে এসব দেশে যে ধরনের শিল্প প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে—তাতে অনুন্নত দেশগুলোর যেমন আর্থিক বা প্রকৃত শিল্পায়ন ঘটছে না, তেমনি

এর ফলে উন্নত দেশগুলোতে—উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শিল্পায়নের বাজার এবং মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ স্থায়ী করবার কাজও চলছে।"—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে যে প্রবন্ধ সে লিখেছে, সেই সব দিনগুলোকে, ভাবনাচিন্তা আবেগে যুক্তিতে যেন অন্যজন্মের মনে হয়।

এখন সে স্থির হ'য়ে চিন্তা করে, কৃষ্ণার বাড়ি যাওয়ার পথে কেন এমন দুঃসহ সময়ের মধ্যে গেঁথে থাকতে হয়। এরপর ফিবে গিয়ে সে আর কোমল আলোর মতন শব্দের কেয়ারি সাজাবে কেমন করে। কৃষ্ণাকে কথা দেওয়া ছিল, যাওয়া হ'ল না। এখন আর কথা রাখা যায় না। আমার কৈশোরের, যৌবনের কাছে, হে সময়, যাকিছু কথা দিয়েছি তোমায়, মুখ ফিরিয়ে বলি, আজ সব ফিরিয়ে নিয়ে যাই। কথা ভেঙে যায়। মানুষের আবাসভূমিতে অপরাধের মানদণ্ড বদল হ'য়ে যায়। সূর্যমন্ত্র মনে পড়ে না। নাকি; অন্য এক ভয়ংকর চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হ'য়ে গেছে? কোমল আলোর মতন শব্দ তরঙ্গ রচনার আড়ালে কী এক নির্মম ঋণপত্র লিখে দিতে হয়, আমৃত্যু উচ্চারণ করি বন্দির বন্দনা? আমার কৈশোর, আমার যৌবন, সমস্ত প্রজ্ঞা তোমাকে লক্ষ্য করে! চুক্তিমতন আমরা সবাই এ উপমহাদেশে, অপিচ এ উপনিবেশে ঠিকঠাক বেঁচেবর্তে আছি। অণুতে পরমাণুতে, অবয়বে কিবা অনুভবে যথোচিত দায়বদ্ধ আছি।

নীলাদ্রির মনে হয়, তারও কি কোন একদিন লাস পড়ে গেছিল? সেও কি কোনদিন নক্ষত্র মতন অদৃশ্য সব গুলির আঘাতে পরবাস পৃথিবীর মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে বলেছিল, হে মহাজীবন, ক্লেদাক্ত জীবন, হে আমার ঔপনিষদিক সত্তা, হে আমার ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত জীবনধারার গর্ভস্রাব, একটিবার আমায় বেঁচে থাকার সুযোগ দাও।

তারপর? তারপর, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ নামে মানুষের পছন্দমতন বেঁচে থাকার জগতে! নোতুন দলিল পাট্টা। ইচ্ছারা নিলাম ডাকে। প্রভুত্বের হাত বদল হয়। বেঁচে থাকুন। বাঁচতে দিন। হিংস্রতার কোন ক্ষমা নেই। হিংস্রতা বর্জন করুন। বিকশিত ক'রো প্রেম-পদ্ম চির মধু নিষ্যন্দ। হে অনন্ত-পূর্ণ। ও আমার চাঁদের আলো।

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা।

নীলাদ্রির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। একী। ছেলেটা যে গোঙাতে গোঙাতে তার আরো কাছে এগিয়ে এসেছে, ওকি মরতে মরতে

নীলাদ্রির নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ওকি বুঝতে পেরেছে ওর কাছাকাছি এখনো একজন জীবন্ত মানুষ নিশ্বাস ফেলছে। যার দিকে ও বাঁচার জন্যে শেষ বারের মতন হাত বাড়াবে। ওকি তাই আরো এগিয়ে আসছে? নীলাদ্রি ভীষণ ভাবে ঘামতে শুরু করল।

হঠাৎ নীলাদ্রির পায়ের ওপর দিয়ে কি একটা চলে গেল। ইঁদুর না ছুঁচো? এখানে, এই অন্ধকারে, সাপখোপ থাকারই কথা। গুলি ছোরার চেয়ে সাপকে আরো বেশি ভয় করে তার। নীলাদ্রির এবার যেন স্থির বিশ্বাস হ'ল তার পায়ের পাতার কাছাকাছি কোথাও একটা সাপ চলে বেড়াচ্ছে। ঘামে তার গেঞ্জি ভিজে যাচ্ছে। নীলাদ্রি শেষ পর্যন্ত মরিয়া হ'য়ে সেই দেওয়াল আর ভাঙা মোটরটার মধ্যবর্তী অল্প জায়গা থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল।

আর বেরিয়ে আসার সংগে একটা রক্তে ভেজা হাত তার পায়ের ওপর এসে পড়ল। পা আঁকড়ে ধরল। নীলাদ্রি পা সরাতে পারল না, ওখানেই থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

এখন কী করবে নীলাদ্রি! মুমূর্ষু ছেলেটার হাতের বেড় থেকে পাটা সরিয়ে নেবে? না যদি নেয়, তবে এই ভাবেই তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এছাড়া আর সে কীইবা করতে পারে! নন্তকে পাঁজকোলা করে বড় রাস্তায় বেরিয়ে যেতে পারে! কোন হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তরুণ এই ছেলেটাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করতে পারে। মানুষ হিসেবে এটুকু তো তার করণীয় ছিল। হ্যাঁ, ছিল বইকি, ছিল, কিন্তু এখন…

এখন নীলাদ্রি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে অন্ধকার পাক খেয়ে যায়। নীলাদ্রির এখন বিবেকের ঘরে ঢুকে টানটান হ'য়ে শুয়ে থাকতে মন চায়। অথচ নন্তুর রক্তে ভেজা হাত তার পায়ের পাতায় থিরথির ক'রে কাঁপছে যে।

হায়রে কিশোর, মাঝে মাঝে কঠিন পাথরের ফাঁকে ঘাসফুলের শিষের মতন ইচ্ছা ফুটে ওঠে, তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই। এই নিরন্তর শবযাত্রা, মহাশ্মশানের অন্তিম অগ্নিকাণ্ডের দিকে প্রতিদিন—প্রতিক্ষণ অমোঘ পদক্ষেপ, বেঁচে থাকা অন্যনাম তার। ইচ্ছে ক'রে আমিও তোমার মত করতলে হৃৎপিণ্ড নিয়ে নাচানাচি করি। দে দোল দোল। দে দোল দোল।

তোমার কি গাঢ় ঘুম এলো?

"দ্বাপর যুগ সমাপ্ত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশে অধর্মের জন্ম হইল।

মিথ্যা হইল অধর্মের সহ-ধর্মিণী। দম্ভ তাহাদের পুত্র। দম্ভ আপন সহোদরা মায়াকে বিবাহ করিল এবং তাহাদের লোভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। লোভও ভগিনী-গমন করে, ফলত তাহাদের ক্রোধ নামে এক পুত্র এবং হিংসা নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। পূর্বপুরুষের ন্যায় অস্থির ক্রোধ ভগিনী হিংসার যোনিতে রমণ করিলে, হিংসার গর্ভসঞ্চার হইল। সেই গর্ভে কলি ভ্রূণরূপে আশ্রয় লাভ করে। কলিও তাহার নিজ ভগিনী দুরুক্তিকে বিবাহ করে। তাহাতে ভয় নামে এক পুত্র এবং মৃত্যু নামে এক কন্যার জন্ম হইল।"

এই জন্মের জন্যে, এই অস্থির ক্রোধে-হিংসায় বারংবার কোন গর্ভ-সঞ্চার ঘটে যায়। এই ভয়, এই মৃত্যু—এমন নিরালোক আমার এ উপমহাদেশে কার কণ্ঠস্বর বারবার ফিরে যায়! রক্তের ভেতরে রক্ত থেমে যায় নষ্ট, অনুভবের ভেতরে অনুভব স্থির হ'য়ে থাকে। এই ভয় আর মৃত্যুর চক্রব্যূহ রচনা ক'রে এ কোন বধ্যভূমিতে এসেছিস তুই! এখানে কি কোলকাতা প্রতিদিন সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে ভেসে যায়—তব প্রেমসুধারস পাবো।

—কৃষ্ণা।

—বলো।

—কৃষ্ণা, তোমার কখনো মনে হয় না, আমরা কেউ যখন আর নিজের ইচ্ছামতন বেঁচে থাকতে পারছি না ; পছন্দ-মতন জীবনটার মধ্যে প্রবেশ-করার সমস্ত দরজা যখন বন্ধ ; তখন প্রতিদিন এই চৌকাঠে মাথা ঠুকে মরার আপোসকে জীবন ব'লে গ্রহণ করা এক ধরনের অন্যায় ?

—তাই কি ? এই গ্রহণকে তো আমাদের ইচ্ছার মধ্যে যাওয়ার পথের কষ্ট বলে মনে করবো আমরা। বরং, জীবন থেকে সরে গেলে অন্যায়কে আরো বেশি ক'রে মেনে নিচ্ছি মনে হয়।

—একে তুমি পথ বলো কৃষ্ণা। প্রতিদিন এই ভাবে নিজের টেনে হিঁচড়ে বেঁচে থাকার চারপাশে কেন্নোর মতন পাকিয়ে পাকিয়ে কুঁকড়ে যাওয়াকে তোমার সাময়িক বলে মনে হয় এখনো। এই পাঁক থেকে আমরা কেউ বেরতে পারবো না, কোনদিন বেরতে পারবো না।

—তাহলে ? তাহ'লে কোথায় পালাবে ? পালানো মানে তো আরো বেশি ক'রে পাকটার মধ্যে চলে যাওয়া।

—ভেবে পাই না, তারও পরে কেন আমাদের বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

—'এইনা সেদিন তুমি বললে, আমাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছাটার মধ্যে দিয়েই আমরা একটু একটু ক'রে বেঁচে থাকি।

—ওটা আমার কাছে সব চেয়ে গোলমেলে কথা। সব চেয়ে বড়ো ধাঁধার কথা। বেঁচে থাকা আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা—গাছ আর বীজের উৎপত্তির দ্বন্দ্বের মতন সব কিছুকে গুলিয়ে দেয়। এখন সময়টাতো সবকিছু লুঠ হ'য়ে যাওয়ার। সমস্ত ইচ্ছার।

—আমরা কোন কিছু ভাঙতে পারি না বলে বারবার বিষণ্নতার মধ্যে ফিরে আসি।

—অথচ আমাদেরো কৈশোর ছিল। সাধ ছিল চারপাশ বদল ক'রে নেবো।

—এখন আমরা কোথায় এসেছি? যৌবন শব্দটাকে বড় অনাত্মীয় মনে হয়।

—আমাদের কৈশোর পেরিয়ে গেলে মৃত-কৈশোরের শুরু হয়। অথচ কথা ছিল, অনেক আগেই কোন একদিন আমরা যৌবনে পৌঁছবো। কী আশ্চর্য! আঠাশ-বসন্তে এসে আজও এই মৃত কৈশোর বহন করে চলেছি।

—আমরা তো বাঁচতে চেয়েছিলাম, নীলাদ্রি!

'আমি বেঁচে ওঠবো নিতুদা, আমায় ফেলে রেখে যেওনা।'

আজ না বুদ্ধ পূর্ণিমা! চাঁদ ওঠেনি কেন?

নন্তুর রক্তে ভেজা-হাত এখনো নীলাদ্রির পায়ের পাতা আঁকড়ে রয়েছে। নীলাদ্রি জানে, সে নন্তুকে বাঁচাতে পারে না। নীলাদ্রি তবু পা সরাতেও পারে না।

বেঁচে থাকুন। বাঁচতে দিন। বাঁচার মেরুদণ্ডের ওপর কোলকাতা পাক খায়। কবে তার কোলকাতা রবীন্দ্রনাথের গান হ'য়ে ভেসেছিল। মনে পড়েনা কোনদিন তার কৈশোরকালও একদা রক্তে ভেসে গেছে কিনা।

সে বুঝতে পারে, এই ভাবে মুমূর্ষু ছেলেটার হাত তার পায়ের ওপর আঁকড়ে থাকলে সে পা সরাতে পারবে না কিছুতেই। তাই স্থির হ'য়ে থেকে ক্রমশ বিপদ বেড়ে ওঠার উৎকণ্ঠা অনুভব ক'রে ভেতরে অস্থিরতা পাক খায়। নিজের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী সত্তাটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বড়ো অসহায় বোধ করে নীলাদ্রি।

কিন্তু অল্প কিছু সময় পরেই নন্তুর গোঙানি থেমে যায়। নন্তুর শরীর নিথর

হ'য়ে আসে। হাতের আঙুল কঠিন হ'য়ে ওঠে। সতেরো আঠারো বছরের কিশোরটি মাটিতে মুখ গুঁজে মরে থাকে। সে মরে যায় বলে নীলাদ্রি খুব সহজেই বেঁচে যায়।

নীলাদ্রি আর কৃষ্ণার বাড়ি যায় না, নিজের বাড়ির পথে ফিরে যায়। বাথরুমে অনেক সময় ব্যয় করে পুরনো ময়লার মতন জমে থাকা ঘামের গন্ধ ধোয়, শরীর শীতল করে। ঘাড়ে পিঠে পাউডার দেয়।

"রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনের উদ্বোধনী বার্তায় সেক্রেটারী জেনারেল উথাণ্ট বলেছেন, গত বছর অস্ত্রের জন্যে বিশ্বে বিশ হাজার চারশ কোটি ডলার অর্থ খরচ করা হ'য়েছে। উন্নয়নশীল সকল রাষ্ট্রের এক বছরের সম্মিলিত আয় এই অঙ্কের সমান হ'য়ে থাকে। তিনি প্রশ্ন করেন, বিশ্বের জনগণ আর কতদিন এই ব্যয় সহ্য করবেন।"—রেডিওর নবটা ঘুরিয়ে দিতে দিতে নীলাদ্রি ভাবে, ফরাসী ভাষায় 'ন্যাকা' শব্দটির যথার্থ পরিভাষা কি হবে। তারপর সে বারান্দার আলোটা জ্বালাতে গিয়ে মনে করে, গত তিনদিন যাবৎ সুইচটা খারাপ হ য়ে আছে।

চেয়ার টেনে অন্ধকারে বসে ফিচারটাকে মনের তলায় গুছিয়ে আনার চেষ্টা করে। সে আর একবার আকাশের দিকে তাকায়। কোথাও চাঁদ নেই। তার লেখার চাঁদটা কিংবা চাঁদের আলোটা যেন এখানকার আকাশটাতে কোনদিনও ছিল না। রিলিফ ম্যাপের মতন আকাশটা ভেঙে আছে। তবু ধোঁয়াটে মেঘ সরেনি। হঠাৎ কেন যেন মনে হয়, কোলকাতায় এখন মেঘের ছায়া নামেনি, বরং উল্‌টো, কোলকাতা ছায়া বিছিয়েছে আকাশটাব ওপর। এমন সময় কৃষ্ণা ফোন করলো।

—কি হ'লো? এলে না যে?

—আটকে প'ড়লাম কৃষ্ণা, উপায় থাকল না।

—কোথায় আটকালে?

—আপাতত অন্ধকার বারান্দাটাতে, আমার লেখার ঘরের মুখোমুখি।

'—'

—বড় বিপদে পড়েছি কৃষ্ণা।

—বিপদ? কিসের বিপদ?

—ফিচার লেখার একটা চুক্তি নিয়ে এসেছি। কালকেই লেখাটা দিতে হবে

—বারান্দা থেকে আপনার লেখার ঘরের দূরত্ব ক'পা মশাই

—এই আটদশ পা হবে বড় জোর। তার বেশি নয়।

—তাহ'লে আর কি, এবার কলমটা নিয়ে ঢুকে পড়ুন।

—ঢুকতে পারছিনা, আটকে যাচ্ছি।

—কেন, কি হ'লো আবার।

—তেমন কিছু নয়, শুধু একটা মৃতদেহ।

—কি বললে ?

—যতবার ঢুকতে যাচ্ছি, ততবারই অন্ধকারে একটা মৃতদেহের ওপর বারবার -পা পড়ে যাচ্ছে।

সারাদিনের শব্দপুঞ্জে কান পাতলে শোনা যাবে নিত্য নতুন অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে। বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তায় অর্কেস্ট্রার আওয়াজ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। গলি এঁকেবেঁকে যেতে যেতে শাখা গলি। অর্কেস্ট্রা আর শোনা যায় না।

কেবল বন্দুক বা রাইফেলের গুলি অথবা হ্যাণ্ডগ্রেনেডের শব্দ।

নাচের ভঙ্গিতে শিস দিতে দিতে সোপে শদরের সিঁড়ি কটি টপকে স্থইং দরজা ঠেলে দিয়েই ডাকল: মা।

যেন এক পায়ে অপেক্ষা করছিলেন বিভা। দ্রুত পায়ে এসে সোপের হাত থেকে বাজারের খালি থলেটা নিয়েই বললেন: বাজার বসে নি?

না। কেবল আলুওয়ালা আছে। আমাদের তো আলু আছে মা?

বললাম বাজার যেতে হবে না। ঘরে যা আছে তাই খাবি।

থলেটা বিভা দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন: তোকে খুঁজতে এসেছিল। তোর জন্যে ওরা কি রাত্রে ঘুমোতে পারে না?

ওরা মানে সুবোধ, নিতাই এবং বলেন।

সুবোধকে বিভা সহ্য করতে পারেন না। খাঁটি মজুরের ছেলে সুবোধ, নিজেও সত্য মজুর। শীর্ণ শক্ত চোখা ছেলে! তড়বড়ে এবং প্রাণবন্ত। খুব কাটাকাটা কথা, বুকের কথা মুখে ঢেলে দেয়। তাই বলে বোকা নয়! কৌশল আবিষ্কার করতে পারে বিপদের জটিল মুহূর্তগুলিতে। নিতাই ও বলেনকেই কি মা সহ্য করতে পারেন? পারেন না। তবু সুবোধের দিকে মায়ের নজর বেশ রুক্ষ ও নিষ্ঠুর। আসলে বিভা ঘর-বিমুখ ছেলেদের একেবারেই পছন্দ করেন না।

বিভার চোখে আদর্শ ছেলে রতন।

সুতির হাওয়াই শার্ট খুলতে খুলতে সোপে প্রশ্ন করল: কোন দিকে গেল?

রান্নাঘর থেকে বিভা বিড়বিড় করে কী বললেন, সোপে শুনতে পেল না।

শুনতে পেল : আর একদিন নয় সেদ্ধ ভাতই খেতিস। এত হাঙ্গামা—বাইরে যাওয়া কেন? বাইরে না গেলে কি তোদের ভাত হজম হয় না?

সেদ্ধ ভাত খেতে আজকাল অনেকেই ভালোবাসে। সোপে তো সকলের আগে। সে অভাব অনটনে থাকা অভ্যাস করছে, বাধ্য হয়ে নয়, আনন্দে। সে গরিবদের সঙ্গে মিশে থাকার সাধনা করছে। গরিবরা তাকেই বন্ধু ভাবে যে তাদের সঙ্গে দুঃখ সহ্য করতে পারে।

গত রাত্রে হয়ে গেছে এক চোট। রাত তিনটে থেকে বড় রাস্তায় ভোর পর্যন্ত চলেছে জলন্ত বারুদের লড়াই। মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দে এ-বাড়ির কেউ ঘুমোতে পারে নি। বাড়িওয়ালারা, সোপেরা, কেউ না। সোপেকে বিভা কতবার শুয়ে পড়তে বলেছেন, সোপে শোয়া দূরের কথা, বসে থাকতে পারে নি, জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিভা সন্দেহ করেছেন : তোর অত উৎসাহ কীসের রে?

সোপে বলেছে : দেখছ, কেমন লড়াই করছে ওরা!

যারা লড়ছে তাদের গর্ব যেন সোপের নিজের।

ঘুমের বাদশা রতন পর্যন্ত বসে—অবশ্য আতঙ্কে। দু হাত দিয়ে খাটের বাজু আঁকড়ে ছবির গায়ে হেলান দিয়েও রতন কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না। সে বারবার ছবিকে প্রশ্ন করছিল : শব্দটা এগিয়ে আসছে নাকি?

সোপে লুঙ্গি গলাল, প্যাণ্ট খুলে ছুঁড়ে দিল দড়ির দিকে, প্যাণ্টটা দড়ি ছুঁয়ে পড়ে থাকল বাক্সের কোণ ধরে।

বিভা বললেন : ঠিক করে রাখতে পার না নিজের জিনিস?

নিজের জিনিসের ওপর সোপের মায়া আছে? দিনরাত বিভার বকুনি খেয়েও সোপের গ্রাহ্য নেই। ছেলেটা যেন কী রকম।

গলিটা একটু দেখে আসছি মা। সোপে দাঁড়িয়ে উশখুশ করতে করতে বলল।

পরশু তো ইণ্টারভিয়ু। বইগুলো একবার চোখ বুলোতেও তো পার।

ওরা যদি অফিস উড়িয়ে দেয়?

অত সোজা নয়। সরকারি অফিস। মিলিটারি পাহারা আছে।

কে জানে মা। কী যে ঘটতে পারে কিছু বলা যায় না।

খুব বলা যায়। তোমাদের যেন পাখা গজিয়েছে! কী আছে রাস্তায়,

অ্যাঁ? কী আছে! দুদণ্ড বাড়িতে বসতে পার না? বাড়িটা কি কয়েদখানা? রাস্তা মানেই তো বিপদের ডিপো!

ইণ্টারভিয়ু দেবে না সোপে। বাড়ি থেকে বেরোবে, যাবে না অফিসে। সে তার জীবনের রাস্তা ছকে ফেলেছে। তবু মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ইঞ্জিনীয়ারিঙের কয়েকটা বই তাক থেকে টেনে এনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বলল: ওষুধ খেয়েছ মা?

ওষুধ খান নি বিভা। সুযোগ পেলেই ওষুধ খেতে বিভা ভুলে যান। সারা জীবন অশান্তি আর অনটনের সংগে লড়াই করে বিভার শরীর ভেঙে গেছে। রতনের চাকরির আগে ওষুধ কেনার পয়সা জুটত না, ডাক্তার দেখানোই হয়নি। এখন দু বছর ডাক্তারের চিকিৎসা চলছে, ওষুধ আসছে, কিন্তু ওষুধ না-খাওয়া এখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, কিছুতেই নিজে থেকে ওষুধ খেতে মন চায় না। যেন একটা বিবমিষা তাঁর কণ্ঠ জুড়ে থাকে সর্বক্ষণ, ওষুধ দেখলে সেটা অসম্ভব বেড়ে যায়।

উনুনের কয়লা বয়ে আনলেন বিভা ভাঙা চাঙারিতে। কয়লা ভেঙে রাখে সোপে। সোপে মাকে অবসর পেলেই সাহায্য করে। মা বাড়ির ঠাকুর চাকর ঝি ধোপা—এক সঙ্গে সব। মায়ের জন্য সোপের বড় কষ্ট। আরও বেশি কষ্ট বোধ করে তার মায়ের মত লক্ষ লক্ষ মা এমন কষ্ট করছে ভেবে। কিন্তু—

বিভা বললেন: খাচ্ছি, খাচ্ছি।

সোপে বলল: ওরা আজ সকালের হামলার খবর জানে না। কোন গলিতে ঢুকে পড়বে! আমি যাই, দেখি।

তুমি ওদের খুঁজতে যাও, আর ওরা ফিরে এসে তোমাকে খুঁজুক! সুবোধের কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।

কী মা! বলতে বলতে সোপে স্যাঁতাপড়া বেতের চেয়ার থেকে খবরের কাগজটা তুলে নিল। ঘরের ভিতর এখন কিছু পড়া যাবে না। দুপুর এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত, এই চারঘণ্টা ঘরে পড়াশুনো করার প্রশস্ত সময়। এ বাড়িতে কোথাও রোদ ঢোকে না, রোদের ফালি পর্যন্ত না। তাতে বিভা খুশিই হয়েছেন। তিনি চান না, বাইরের জগত কখনো কোনো প্রকারে ভেতরে ঢোকে। রতনের বিয়েতে রতন কনেপক্ষর কাছে একটা রেডিওর কথা বলেছিল, বিভা স্পষ্ট অমত জানিয়েছিলেন।

এম-এ পাশ করার পর চাকরি খোঁজার অজুহাতে রতন খবরের কাগজ নিতে আরম্ভ করেছিল। চাকরি হয়ে যাবার পর বিভা প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজ বন্ধ করার জন্য ঘ্যানঘ্যান করতে শুরু করেছিলেন। সোপের চাকরি-খোঁজা আবার আরম্ভ হওয়ায় কিম্বা চাকরি খোঁজার অভিনয় শুরু হওয়ায়, খবরের কাগজটা বন্ধ হয় নি।

খবরের কাগজে কেবল খুনোখুনির সংবাদ।

কে কাকে শেষ করে তার রেষারেষি।

এ পাড়াতেও চলেছে সেই পালা। আজকাল পুলিশ সি-আর-পি ও মিলিটারি ঢুকছে বাড়ি বাড়ি। যে বাড়িতে ঢুকছে, সে-বাড়ির চেহারা বদলে যাচ্ছে; লেপ-তোশকের তুলো পর্যন্ত উড়ছে রাস্তায়। পুলিশ বা মিলিটারি অন্যায় কী ন্যায় করছে, সে নিয়ে প্রশ্ন বা অভিযোগ পেশ করা চলে না, আর পেশই বা করবে কার কাছে। কোর্টে পর্যন্ত কেস নিয়ে যাওয়া বৃথা। বিচার হবে না, পুলিশ ধরে আগে বেধড়ক ঠ্যাঙাবে, ঢুকিয়ে দেবে জেলে, নিয়ে যাবে কোর্টে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। পড়ে থাকুক জেলে এখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হোক আর নাই হোক, পচুক জেলে।

কাগজে চোখ ডুবিয়েও সোপে বুঝতে পারল, বউদি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিচ্ছে। বরাবর বিভা ওঠেন সর্বাগ্রে, তারপর সোপে, তারপর ছবি, সবশেষে রতন। রান্নাবান্না চুকে গেলে অফিস যাবার সময় রতন বিছানা থেকে নামবে; বিছানায় উঠবে ঠিক সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে। মায়ের বশম্বদ, অতি বাধ্য ছেলে, আদর্শ ছেলে রতন।

বাড়ির ভিত কাঁপিয়ে কানফাটা বজ্রের মত শব্দ ফাটল, দুম। ছবি পিছল বারান্দা পেরোচ্ছিল, পা হড়কে পড়ে যেতে যেতে খুব ভাগ্যের জোরে সোপের কাঁধ ধরে সামলে নিল।

কিন্তু স্বতস্ফূর্তভাবে ছবির ঠোঁট দিয়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে পড়েছে—আঁ—আঁ—আঁ...। ছুটে এলেন বিভা: লেগেছে বউমা? সাবধানে চলাফেরা করবে। এখনই তো বিপদের সময়।

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ছুটতে ছুটতে ছবি রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। বাঁ পায়ের গোড়ালি ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে দিতে লাগল, নিজে নিজে ডলতে লাগল। এবং হাসতে লাগল।

না না, পড়ে নি, আছাড় খায় নি। সান্ত্বনা দিল সোপে।

বাইরের উদ্দেশে বিভা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন: মানুষ তো মারছেই। পেটের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত শেষ করে দেবে! কী দায় পড়েছে তোদের, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে কে বলেছে!

কিছু বদলাবার চেষ্টা করছে মা। গম্ভীর গলায় সোপে বলে।

কোনো দরকার নেই। যা আছে তাই থাক। যেমন চলছে তেমন চলুক। দিনকাল তো বদলাল, কত বদলাল। কী সুখ পেলাম। অ্যাঁ?

ধোঁয়ায় বাড়িটা কুহক জালে আচ্ছন্ন হয়ে ভেসে যাচ্ছিল। ক্রমশ ধোঁয়ার বন্যা সরে গেলে আবার বাড়ির ভিতর পত্রহীন গাছের মত ঘরের আসবাবপত্র ও মানুষ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিভার ভাঙা গাল, বসা চোখ, প্রশস্ত কপাল ও শুকনো ডালের মত নীরস নাক, ঢ্যাঙা শরীর।

শিবতোষ ছিলেন খর্বাকৃতি। শিবতোষের আকার পেয়েছে রতন। সোপে মায়ের মতন ঢ্যাঙা ও শীর্ণ, কিন্তু শক্ত-শক্ত চেহারাটা।

ঝাড়ু হাতে বিভা ঘরে ঢুকলেন। সামনেই শিবতোষের ফটো। ফটোতে জড়ানো শুকনো মাধবীর মালা।

ফুল পেলি না?

কলেজের বাগানে পা দেবার উপায় আছে? গোল করে ঘিরে আছে সি-আর-পি।

ফুল পাহারা দিচ্ছে নাকি রে?

ফুল যদি ফুলকির মত জ্বলে ওঠে! বদলাচ্ছে কিনা। সবই তো বদলাচ্ছে। কুণ্ডুদের বাড়ি থেকে ফুল নিয়ে আসব মা?

কুণ্ডুদের বাড়ি! আতঙ্ক বিভার কণ্ঠে।...সে তো বড় রাস্তা পার হয়ে যেতে হবে। যা উনি সুখ দিয়েছেন, রোজ রোজ আর ফুলের মালা দিতে হয় না!

মেঝেতে বিভা কয়েকবার ঝাঁটা আছড়ালেন।

শিবতোষের ফটোতে ফুলের মালা পরাবার উৎসাহ ছিল রতনের। বিয়ের পর রতন বাবার ফটোতে মালা দেবার ব্যাপারে ঝিমিয়ে পড়ল। সোপের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে রোজ ফুল জোগাড় করে আনতে হচ্ছে। বিভার মুখে শিবতোষের অহিংস দেশপ্রেমের কাহিনী শুনে সোপে বলে: বাবা বোকা ছিলেন, অবশ্য সৎ এবং মহৎ। যাই হোক মানুষকে আবার পুজো করা কেন!

রতন বলত : পূজো নয় শ্রদ্ধানিবেদন।

খাঁটি দেশপাগল ছিলেন শিবতোষ। সতের বছর বিবাহিত জীবনের ফসল মাত্র দুটি সন্তান। এতেই তাঁর দেশপাগলামির পরিমাণ ধারণা করা যায়। সাধারণ গোবেচারা ভালোমানুষি মুখ ফটোতে হাসছে…স্বপ্নার্ত দুটি চোখ। ওই চোখের দৃষ্টিতে বা মনের ধারণায় নিশ্চয় কখনো ধরা পড়েনি, যে, অনাবিল ও সৎ চেষ্টার ফসল অসৎ ও শয়তান হতে পারে। শয়তান মাথা চাড়া দিয়ে একচ্ছত্র প্রভুত্ব করতে পারে, অনেক কিছু গ্রাস করতে পারে।

বিভা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। শিবতোষের সঙ্গে বিবাহিত জীবনে বিভার সাক্ষাৎ ঘটেছে কচিৎ-কদাচিৎ। সতের বছরে বড় জোর সতের দিন। কিন্তু সতেরটা দিনই বিভা শিবতোষকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিভা বলতেন : কী দরকার বাড়ি আসার ? এসে কেবল দুঃখ বাড়ানো।

না, মায়ার দুঃখ নয়। দুঃখ পুলিশ হামলার।

শিবতোষ বলত : তোমরা কেমন আছ, মাঝে-মাঝে জানতে, দেখে যেতে বড় ইচ্ছে হয়।

খবর তো পাও মরে যাই নি ! মরে গেলেই ছিল ভালো।

বিভা সুখে লালিত। বিয়ের পর বিভা আর সুখের মুখ দ্যাখেন নি। সে জন্য বিভা সকলের কাছে স্বামীর নামে গালাগাল দিতেন, স্পষ্ট বলতেন, না দেখেশুনে বাবা আমাকে হাতপা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে !

বিভার আফসোসের আর অন্ত ছিল না।

পুলিশের হাতে শিবতোষ ধরা পড়েছিলেন এবং অত্যাচারিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিভার সঙ্গে সতেরটা রাত্রিবাসের চিহ্নের চাইতে সেই চিহ্নগুলি অধিকতর মর্মান্তিক ছিল না।

সোপে বলল : বাবা কি ইচ্ছে করে তোমাকে দুঃখ দিয়ে গিয়েছে ? তা নয় মা। বাবা তো সকলের সুখের জন্যই চেষ্টা করেছেন।

বিভা ছিলেন সুখের কাঙাল। বললেন : তবে আমি কেন কেবল দুঃখকষ্টই পেয়ে গেলাম ! তবে গোটা দেশটা দুঃখ পাচ্ছে কেন ?

চেষ্টা করলেই এখন সুখ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ সুখ পায়, কেউ সুখ ও দুঃখ দুই মিশিয়ে পায় ; কেউ বা পায় কেবল দুঃখ। কিন্তু সকলে যাতে সুখ পায় তার চেষ্টা অনবরত চালিয়ে যেতে হবে মা। তার জন্য অনেক দুঃখ অনেক কষ্টও সহ্য করতে হবে।

ঝাঁটা থামিয়ে বিভা বললেন : চেষ্টা করার পর যদি কপালে দুঃখ জোটে কেবল, অমন চেষ্টার মুখে ঝাঁটার বাড়ি—ঝাঁটার বাড়ি।

হেসে ফেলল সোপে। অদূরে দেয়াল কাঁপিয়ে বোমা ফাটল।

বিভা বললেন : ওরা কিসের চেষ্টা করছে ? যমের বাড়ি যাবার চেষ্টা ? সব দুঃখ একেবারে চুকিয়ে দেবার চেষ্টা ?

ওরাই এই প্রথম, ঠিক রাস্তায়, সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মা !

বলেই সোপে মায়ের অজান্তে খবরের কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে রাস্তায় উধাও হয়ে গেল।

রতন নিয়মভঙ্গ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে আধ-ঢাকা বারান্দায়। দাঁত ব্রাশ করতে লেগেছে। ও আজ স্থানীয় এম-এল-এর কাছে যাবে দরবার করতে। হঠাৎ অফিসে রতনকে নোটিশ দিয়েছে বদলির। ওর জায়গায় আসছেন কোনো বড় কর্তার বড় সম্বন্ধী।

শিবতোষ জীবনে কিছুই রোজগার করেন নি। বিভা নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে তাঁর গয়না ও ভিটের জমি বিক্রি করে কলকাতায় সস্তা দামে একটা বাড়ি কিনেছিলেন বিডন স্ট্রীটে। ওটা লীজ দিয়ে কুড়ি বছর সংসারের কাঁচা টাকার অভাব ঘুচিয়েছেন জোড়াতালি দিয়ে। গ্রামের ধান বিক্রি করেও টাকা নিয়ে এসেছেন বছর বছর। এখন বিডন স্ট্রীটের বাড়ির লীজ ফুরিয়ে এসেছে। কয়েক মাস বাদেই নিজেদের বাড়িতে উঠে যাবেন ; অর্থাৎ নিজের বাড়ি, চাকরে ছেলে স্বাস্থ্যবতী বউমা—বিভার জীবনে যখন সুখের নিটোল মুখটা উঁকি মেরেছে, তখনই রতনকে মফস্বলে দিয়েছে বদলি করে। রতনকে মফস্বলে যেতে হলেই সংসার ভেঙে যায়। কারণ রতন একটি বৃহদাকার শিশু বিশেষ, বউমা কিংবা মা ছাড়া রতন বাড়িতে অচল।

রতন বাড়িতে যেমন আছে কি নেই অনুভব করা যায় না, অফিসেও তদ্রূপ।

বিভা রতন ছবি সবাই চায় বদলিটা রদ করতে হবে। নইলে বিভার যে সুখের সংসার অন্তঃসত্ত্বা সেটি অকালে নষ্ট হতে বসেছে।

বদলি বাতিল করতে পারে শিবতোষের বন্ধু বর্তমান এম-এল-এ রজতকান্তি।

ঝাঁটায় আবর্জনা তুলে বিভা এলেন বাইরে। প্রশ্ন করলেন : উঠে পড়লি যে ?

এক মুখ শাদা ফেনা ছুঁড়ে রতন বললে : রজতের পায়ে তেল দিতে হবে না ?

গম্ভীর স্বরে বিভা ঝাঁটা হাতে যেতে যেতে বললেন : আজ থাকগে।

মুখ ধুয়ে চা পান করে নিঃশব্দে রতন আবার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক স্তব্ধতা। সামন্তদের চিলেকোঠায় কবুতরের ঝাঁক কেবল বকম বকম করছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা পরপর কোথায় বোমা ফাটল···গুলির শব্দ হল···বড় রাস্তা থেকে তুমুল কোলাহল গলির ভিতরে ঢুকে পড়ছে, ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে।

বিভা ঘুমোচ্ছিলেন, যুদ্ধের শব্দে তাঁর ঘুম গেল ভেঙে।

সোপে দুপুরে এসে নামমাত্র খেয়ে আবার কোথায় পালিয়েছে।

কী যে করে ছেলেটা!

বিভা বিছানা ছেড়ে নামলেন।

তার কিছুক্ষণ আগে সোপে, সুবোধ, নিতাই ও বলেন ছুটে এসে ঢুকে পড়েছে বাইরের বারান্দায়। এখনো তারা হাঁপাচ্ছে। চারজনেই মূক।

সুবোধ বলছে : রামকে শেষ করে দিয়েছে ভোরে, কাল রাত থেকেই শুয়োরের বাচ্চারা ঘাপটি মেরে ছিল।

রামের বাড়ি আসা উচিত হয় নি। রাগের বশে বলল বলেন।

আরে ও যে বাড়ি এসেছিল গোপনে।

স্পাই ঢুকেছে স্কোয়াডে, গোপনতা আর থাকছে না।—নিতাইয়ের চাপা গর্জন।

সব জায়গায় একই রিপোর্ট। রোজ যাচ্ছে আটটা দশটা করে। বলেনের কণ্ঠে অনুতাপ।

হতাশ হয়ে পড়ছিস? বলেনের পিঠ চাপড়ে দিল সুবোধ।

কোথায় একটা ভুল হচ্ছে আমাদের। সোপে বলল আত্মগত স্বরে।

ভুল আছে বইকি, এত বড় যুদ্ধ আর ভুল থাকবে না!

কিন্তু ভুলটা ধরতে না-পারলে আমরা শেষ হয়ে যাব।

শেষ আমরা হতেই পারি না। কিন্তু ভুলটা ধরতে হবে বইকি!

কী ভুল বল তো? নিতাই প্রশ্ন করে।

সব চেয়ে বড় ভুল আমরা জনগণের কাছে রাজনীতি নিয়ে যেতে পারছি না।

সুবোধ বলে : সব চেয়ে বড় ভুল জনগণ এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করছে না।

তাহলে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া উচিত।—নিতাই যেন দাবি পেশ করে।

তাহলে আরও বড় ভুল হবে।

কেন ?

এ যুদ্ধ সাধারণে প্রশংসা করছে, সেটাই আমাদের সার্থকতা।

কিন্তু শুধু প্রশংসা করলে তো একে দীর্ঘকাল চালিয়ে নিয়ে যেতে পারা যাবে না। সস্স মাসিমা…

কী করছিস তোরা, ঘরে আয়।—বিভাকে দেখা গেল সুইংদরজার ফাঁক দিয়ে।

কয়েক জন ভয়ার্ত পথিক ঊর্ধ্বশ্বাসে গলিতে ঢুকে ছুটতে ছুটতে চলে গেল। আবার গুলির শব্দ হল বার দশেক। বিভার নাকে এসে লাগল বারুদের গন্ধ।

আয়…ভিতরে আয়। বিভা রাগে গরগর করছেন।

বিভা সোপের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে এসে তবে থামলেন। তিনজনে সোপেকে অনুসরণ করল।

দিনে সুখ নেই রাত্রে সোয়াস্তি নেই। রাত্রি দেড়টার সময় এক সঙ্গে অজস্র হাতবোমা ও রাউণ্ড কয়েক ফায়ারের শব্দ।

স্বপ্ন দেখছিলেন বিভা। কোনো আতঙ্কের শব্দ। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন, গাঢ় ঘুম হয় না আজকাল। তন্দ্রা কেটে যাবার সন্ধিক্ষণে চিৎকার করে উঠলেন: কষ্টে থাকি আর সুখে থাকি, বেশ আছি। নষ্টামি, যত সব নষ্টামি।

ঘুম ভেঙে গেল নাসারন্ধ্রে এক ভয়ঙ্কর গন্ধ লেগে…বারুদ! সোপে? পাশে সোপে নেই! দরজা খোলা। বেরিয়ে এলেন।

রতন, অ রতন! রতন ও ছবি ধড়মড়িয়ে উঠে এল। সোপে কোথায়? ওরা কী বলবে। ওরা তো জানে, নিজেরাই ঠিক আছে।

সদর দরজার তালা খোলা, ভিতর থেকে তালা দেওয়া থাকে। সবাই রকে এসে দাঁড়াল। রতনের মুখ খুলে গেছে: রাস্কেল, ইম্পার্টিনেণ্ট…ওকে তুমিই আস্কারা দিয়ে মাথা খেয়েছ।

বিভার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, রক্তস্রোত ক্রমশই শ্লথ, চোখের নজর আবছা হয়ে যাচ্ছে। তিনি কিছুই বলতে পারছেন না।

ছবি দুদিক সামলাবার চেষ্টায় বলল: ছেলেমানুষ, হয়তো কৌতূহল জেগেছে।

থাম! গর্জে উঠল রতন, রতনকে এখন অনেরটা মানুষের মত দেখাচ্ছে : তোমাকে আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। আসুক শুয়ারের দাঁত ঝেড়ে ফেলব।

বিভা বিড়বিড় করলেন : আসুকই আগে সুস্থ শরীরে। তারপর দাঁত কেন, যা পারিস ঝাড়বি।

সিঁড়ির সর্বনিম্ন ধাপে নেমে রতন তার নজর যতদূর পারল ছুঁড়ে দিল, দূরে শব্দ ফাটল, দুম। এক লাফে রতন ফিরে এল রকের মাথায়, আঁকড়ে ধরল ছবির কোমল দুটি হাত।

বিভা ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছেন, বলছেন : ওই সব ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশে সোপেটা গোল্লায় গেছে।

ছোটলোকের ছেলে মানে সুবোধ। ওকে মনে-মনে বিভা একেবারে দেখতে পারেন না।

ছবি বলল : সোপে তো বলে ও নাকি আমাদের চাইতে মানুষ হিসেবে অনেক বড়।

বিভার কানে ছবির কথা পৌছয় নি। ক্রমশই তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছেন।

রতন চেঁচাল : মা, মা কোথায় যাচ্ছ! মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।

ছবি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল : ওগো যাও···বুড়ো মানুষ, এই অন্ধকারে কোথায় হোঁচট খেয়ে পড়ে থাকবেন।

দুটো হাত সামনের দিকে ঝেড়ে রতন বললে : কী যে করব আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার হয়েছে বিপদ। বিয়ের পর একদিন যদি সোয়াস্তিতে রাত কাটিয়েছি! মা—ও মা—রতন যথাসাধ্য জোরে চেঁচাতে লাগল।

ততক্ষণে বিভা অদৃশ্য হয়ে গেছেন। গলিতে কে বা কারা আলোর ডুমগুলি কানা করে দিয়েছে, প্রায় সব কটা। বাঁ হাতি একটা হলদে ডুমের আলো জ্বলছে টিমটিম করে। দূরে অস্পষ্ট কোলাহল। কোলাহলটা হঠাৎ স্ফীত হয়ে উঠল। কাদের পায়ের শব্দ পেয়ে রতন ছবির হাত ধরে টানতে টানতে ঘরে গিয়ে কপাট দিল। মুহুর্মুহু বিস্ফোরণের শব্দ আবার। ছবি সামান্য ধাতস্থ হবার পরেই রতনকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে এল। কয়েকজন যুবক প্রাণপণে ছুটে পালাল চোখের সামনে দিয়ে। ছবি তাদের প্রশ্ন করল। জবাব

দেবার আগেই তারা অদৃশ্য। অদূরে মিলিটারি ভ্যানের প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল। রতন ও ছবির বুক প্রায় সমতলে ওঠানামা করছে ইঞ্জিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এল সুবোধ। তার গায়ে জামা নেই। গায়ের জামা দিয়ে বাঁ হাত জড়ানো। অস্পষ্ট আলোতেও বোঝা যাচ্ছিল জামাটা রক্তে ভিজে গেছে।

বউদি, তুলো ন্যাকড়া ছেঁড়া ডেটল বেঞ্জিন যা আছে খুব তাড়াতাড়ি রেডি করুন।

ছবি বললে ঃ ঘরে এস বেঁধে দিচ্ছি···দেখি—তোমার হাত।

সুবোধ হাত সরিয়ে বললে ঃ আমার জন্যে পরে হবে—আগে মাসিমাকে···

বলতে বলতেই নিতাই ও বলেন মাসিমাকে কাঁধে করে এনে ঢুকল বাড়ির ভেতর। বাঁ বাহু ভেদ করে গেছে রাইফেলের গুলি। রক্ত বন্ধ করা কি সহজ কাণ্ড! যতই ব্যাণ্ডেজ পাক দেওয়া হচ্ছে, রক্ত উঠছে ছাপিয়ে। বিভার জ্ঞান নেই। একটা ছেঁড়া ধুতি লেপটে দেওয়া হল। ধুতিটা রক্তে ভিজে গেল।

নিতাই বললে ঃ সুবোধ মাসিমাকে ধরে সরিয়ে না নিলে হয়ে যেত···

ছবি ভেজা গলা গলায় বললে ঃ দেখি—দেখি তোমার হাত!

সুবোধ বললে ঃ শালা হাতটা মাংসের। গুলিটা আমার হাত দিয়ে ঢুকে লেগেছে মাসিমার বাহুতে।

বড় আফশোস সুবোধের ভাষায়।

সবাই মাসিমা ও সুবোধকে নিয়ে ব্যস্ত।

শেষে সুবোধের হাত বেঁধে দিল ছবি। কিন্তু তারও ব্যাণ্ডেজ ভিজে যেতে লাগল। রক্ত থামতে চায় না। শেষ পর্যন্ত ভেজা ব্যাণ্ডেজ নিয়েই উঠে পড়ল সুবোধ। ওদিকে গুলি ও হাতবোমার শব্দ থেমে এসেছে।

রতন বললে ঃ শুয়ারটা কোথায়?

নিতাই, বলেন ও সুবোধ পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করল। বিভার গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছিল। মাথার উপর ফ্যান চলছিল সোঁ-সোঁ করে। বিছানার চাদরে রক্তের দাগ লেগে যাচ্ছিল। ঘরে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে···নিতাই সুবোধ ও বলেনের চোখের কোণে কালচে ছায়া, চোখে লালচে ঘোর··· তিনজনের চোখ একেবারে নিথর।

সুবোধ একটা মোড়ার ওপর বসেছিল।

মজুরের ছেলে, সন্থ মজুর সুবোধ মোড়া থেকে উঠে দাঁড়াল, তার রক্তাক্ত বাঁ হাত বুকে ঠেকিয়ে থাকল চুপচাপ।

রতন জ্ঞানহীন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গর্জন করলঃ কোথায় শুয়ারটা।

রক্তে ভেজা বাঁ হাত দিয়ে সুবোধ তার বুক চেপে ধরল, ঠোঁট ও তার মাথা কেঁপে উঠল, সে চাপা স্বরে বললেঃ আমার বুকে। সোপে আছে আমার বুকে।

ওর শোধ নিতে আমরা—হ্যাঁ আমরাই বেঁচে আছি। বলেই নিতাই, বলেন ও সুবোধ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে একেবারে গলির আঁকাবাঁকা অন্ধকারে॥

গণতন্ত্র এবং গোপাল কাহার

মণি মুখোপাধ্যায়

ছিন্নদলিতকুসুমযুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। নিকটবর্তী আঙ্গিনায় তাহাদের গুটিকয় শিশু সন্তান ধূলায় কর্দমে লাফাইয়া কাঁদিয়া অস্থির করিতেছে। উহাদের তৈজসপত্রহীন ভগ্নগৃহ। উহাদের দেহ অস্থিচর্মসার। উহাদের সম্মুখে বাংলাদেশের নিষ্করুণ বর্ষাকাল। উহাদের সম্মুখে ক্ষুধা। অথচ কী অনির্বচনীয় পরিহাস—এই সময়, এই দম্পতির আঙ্গিনার সন্নিকটস্থ বৃহৎ তেঁতুল বৃক্ষের মাথায় যাইবার কালে অপরাহ্ণ শেষবারের মত হাসিয়া উঠিল।

আসলে লোকটির নাম গোপাল কাহার। সে জন্মাবধি দরিদ্র বলে, সকল সময় ক্ষুধায় কাতর বলে, মনের দিক থেকে সে সকল সময়েই একটু অপ্রস্তুত। কোন বিষয়কে পরিষ্কার করে বুঝতে তার যথেষ্ট সময় দরকার হয়। এবং সেই সময়ের মধ্যেই আর একটা নতুন বিষয় এসে পুরনোটা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে সমস্তক্ষণই তাকে মনে হয় এলোমেলো।

আজ যখন সে বাড়ি ঢোকে, তখন তাকে আরো বেশি এলোমেলো মনে হচ্ছিলো। গেল বছর বর্ষার মরশুমের আগে তারা এ তল্লাটের গরিব গুরবো মানুষগুলি মিলে ঝুলে মিটিন্ মিছিল করে বড় জোতদার প্রসন্ন হালদার মশায়ের রেল লাইন বরাবর কিছু বেনাম জমি দখল করেছিলো। সবাই মিলে সেসব ভাগজোক করে চাষ আবাদ চালাচ্ছিলো। মাস চারেকের খোরাকি আসছিলো ঘরে। বাদবাকি মাসগুলি জনমজুর খেটে, একবেলা খেয়ে, বউ পরের বাড়ি ভানা কোটা করে কোন রকম চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। এবারের বর্ষার মরশুম এসে যাওয়াতে গত রাত ভর টানা বাদলা পড়াতে, সে দেখতে গিয়েছিলো জমিতে জল দাঁড়িয়েছে কিনা।

জমির কাছাকাছি আসতেই একটা অদ্ভুত হাঁক শুনে সে থমকে দাঁড়ালো।

"অ্যাই কাহারের বাচ্চা!"

স্বভাব মত গোপাল খুব হকচকিয়ে গেলো। কয়েকমিনিট কিছুই তার

নজরে এলো না। তারপর বেশ ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, রেল লাইনের নাবালে ছাতা হাতে প্রসন্ন হালদার মশাই বৃহৎ কেঁদো বাঘের মত দাঁড়িয়ে আছেন। লাঠি সড়কি হাতে তার চারপাশে দশবারো জন লোক। গোপাল আরো ঘাবড়ে গেলো।

লোকগুলোর মধ্য থেকে কে একজন হেঁকে বললো, "কিরে, চাষ করবি?"

দু'বার মাথা চুলকে ঢোক গিলে গোপাল বললো, "তাই এলম, জমিনে জল ডেঁড়িয়েছে কিনা দেখবার জন্যি।"

ওপাশের গলাটা যেন বেশ রঙ্গ করার ভঙ্গিতে আবার হেঁকে বললো, "তা দেখ। জমিনে জলও ডেঁড়িয়েছে, আমরাও ডেঁড়িয়েছি। চাষ কর।"

গোপাল আরো ঘাবড়ে গেলো। তার মনের ভেতরটা এলোমেলো হয়ে গেলো। সে জমির দিকে দু'পা বাড়াতেই ওপাশ থেকে সড়কি উঁচিয়ে দুজন তেড়ে এলো।

"শালা কাহারের বাচ্চা!"

গোপাল আর দেরি করলো না। বাবলা বনের ভিতর দিয়ে টেনে দৌড় লাগালো। আর পরিষ্কার শুনতে পেলো, পিছনে বৃহৎ কেঁদো বাঘের মত প্রসন্ন হালদার মশাই গাঁক্ গাঁক্ করে হাসছেন।

বড় বড় করে দম নেবার ফাঁকে ফাঁকে পাড়ায় এসে ঘটনাটা সবাইকে বুঝিয়ে বললো গোপাল। শুনে সকলের চোখে মুখে আষাঢ়ের আকাশ কালো হয়ে এলো।

"উঁয়ারা উচ্ছেদ চাইছেন।"

"সব্বোনাশ! তেবে?"

"উবেলা সমিতিকে সব জানাই চলো।"

অবশেষে সেটাই সাব্যস্ত হলো। ওবেলা সবাই মিলে কৃষক সমিতির কাছে উপায়ের সন্ধান করতে যাবে।

গোপাল বাড়ি মুখো হলো। তার মন খুব এলোমেলো হয়ে গেলো। বারো মাসের মধ্যে গেল বছর যে চার মাসটা নিশ্চিন্দি ছিলো, এবারে সেটাও ঐ অনিশ্চিন্দি আট মাসের দলে ভিড়ে গেলো। তা হলে উপায়! দাদে রোদ লাগার মত গোপালের মাথার ভেতরটা চিড়বিড়িয়ে উঠলো!

গোপাল যখন নিজের উঠোনে ঢুকলো বেলা তখন তিন প্রহর পার। বাচ্চাগুলি উঠোনোর ধুলো কাদায় কাঁদছিলো। বউ ভাঙা বেড়ার গায়ে

ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। গোপাল এক পলক ছবিটা দেখে নিয়ে বললো, "উয়াদের খেতে দিস্ নাই ?"

"কুথা থিকে দুবো !"—বউয়ের গলায় বেশ ঝাঁঝ।

"কেনে, ভানা কোটায় যাস্ নাই আজ ?"

"গিয়েলম্।"

"তেবে ?"

"উয়ারা মোকে দে আর ভানাকোটা করাবেক নাই।"

"কেনে—কেনে ?"

"বললেক, তু গোপাল কাহারের বউ বটে, তোকে দে আর ভানা কোটা করাবোক নাই। হালদার মশাইর মানা আছে।"

চড়াক্ করে মেজাজ চড়ে গেলো গোপালের। আর বউ ছেলেপিলের উপর মেজাজ নিলে পালটার ভয় নেই বলে মেজাজটা হলো দ্বিগুণ। বউয়ের পিঠে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিলো গোপাল। আর বউয়ের বাতাস-চেরা চিল চিৎকার কানে যেতেই উঠোনের কাচ্ছা বাচ্ছা কটাকে ঘা কতক বেশ ঠেঙ্গিয়ে দিলো।

তারপর গুম হয়ে বসে রইলো ঘরের মধ্যে।

এই অবধি এই রকম।

তারপরেই একটা অন্য রকম ব্যাপার ঘটে গেলো গোপাল কাহারের ভাঙা বাড়িতে।

প্রথমে একজন। তার পিছনে আরো একজন। তার পরে আরো। এবং তার পিছন পিছন আরো কিছু। ঐ দিক থেকেই এলেন ওরা, যেদিকটায় তেঁতুল গাছ। মস্ত তেঁতুল গাছের দিগ্-বেড়ানো ছায়াখানা আগাম সন্ধ্যা ঘনিয়ে তুলেছে গোপালের উঠোনে, ভাঙা ঘরে। গোপাল কিছু ঠাহর করতে পারলো না। ওবেলার বিষম ঘটনায়, সারা দিনের ক্ষুধায় ক্লান্ত শরীরটা গুলিয়ে উঠলো। গায়ে কাঁটা দিলো গোপালের। তবে কী ভর সন্ধ্যেতেই ওনারা নামলেন তেঁতুল গাছ থেকে। কিন্তু ইতিপূর্বে তো কোনদিন গোপাল ওনাদের অস্তিত্ব টের পায়নি। তা হলে হেতম ওঝাকে ডেকে ঝাড়ফুক্ মন্তর করানো যেতো। গোপাল তার বউয়ের দিকে ঘন হয়ে বসলো।

ব্যাপারটা নজরে এসেছিলো বউয়েরও। ক্ষুধায় দুঃখে রাগে অপমানে মারের জ্বালায় চট করে কোন জিনিসকে মালুম করে উঠতে পারছে না। সব

চাইতে করুণ অবস্থা বাচ্চাগুলির। খাঁচার দোর গোড়ায় লোভী শিয়াল ওৎ পেতে থাকলে যেমন মুরগীর পাল এক কোনায় গিয়ে তালগোল পাকিয়ে থাকে, দিগম্বর বাচ্চাগুলি তেমনি উঠোনোর এক কোনায় জড়সড়ো হয়ে ভয়ার্ত চোখ মেলে দেখতে লাগলো ব্যাপার স্যাপার।

"কাম আউট! বাহার নিকালো। অ্যাই শুয়ারের বাচ্চা, বাইরে আয়।"

আর তৎক্ষণাৎ গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। একটি বাজখাঁই চিৎকারে গোপাল কাহার এবং তার বউয়ের চোখ থেকে তাবৎ অন্ধকার মুছে গেলো।

হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো গোপালের বউ, "ও মাগো—এযে পুলুশ!"

পুলুশ! সব্বোনাশ! গোপালের হৃৎপিণ্ডটি খাঁচার বাইরে আসার জন্য বার দুয়েক টেনে লাফ মারলো। তারপর ব্যর্থ হয়ে নিজের জায়গায় বসে হাঁপাতে লাগলো। এ নির্ঘাৎ প্রসন্ন হালদার মশায়ের কীর্তি। এতে আর কোন ভুল নেই। চোখে আবার অন্ধকার দেখলো গোপাল।

উঠানে সটান নেমে এসে হাত জোড করে কাঁপা কাঁপা গলায় গোপাল বললো, "এজ্ঞে আমি কিছুই করি নাই। উয়ারা আমাকে সড়কি দেখালেক, আমি টেনে বাবলা বনের ভিতর দিয়ে ছুট্‌টে এলাম। এজ্ঞে, আমি টু শব্দটি করি নাই।"

টুপির তলায় মোটা ভুরু কুঁচকে ও. সি. সাহেব একটা ধাড়ি বাঘের মতো গোপালের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। লোকটা আসলে কী বলতে চাইছে। কয়েক দিনের ভিতরে এরকম ধরনের কোন কেস তার হাতে এসেছে বলে তো মনে পড়ছে না। ভুরু জোড়া আরো কুঁচকে স্মরণ শক্তিকে অধিক তীক্ষ্ণ করতে চাইলো ও. সি. সাহেব।

আর ঠিক তখনই সাব ইন্‌সপেকটর মল্লিক কানের কাছে মুখ এনে চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, "ইয়েস স্যার, গত মাসের এগারো তারিখে কুঁদপুরের বাবলা বনে আমাদের আই. বি. র যে লোকটা সড়কির ঘায়ে খুন হয়েছিলো, আপনার মনে আছে?"

"ইয়েস, ইয়েস!"—কুঁচকানো ভুরু মুহূর্তে টান হয়ে উঠলো ও. সি. সাহেবের।

মল্লিক আবার বললো, "লোকটা ডেফিনিটলি ঐ ঘটনার সঙ্গে ইনভল্‌ভড। হঠাৎ রেইডেড হওয়াতে ভয়ে কনফেস করে ফেলেছে।"

মল্লিকের বুদ্ধিতে চমকিত হলো ও. সি. সাহেব। কাল বিলম্ব না করে চওড়া গলায় হাঁকড়ে উঠলো, "পাকড়ো ইসকো।"

মুহূর্তে তিন দিক থেকে তিনটি রাইফেলের নল এসে গোপাল কাহারের শীর্ণ শরীরে ঠেকলো। নলের শীতল স্পর্শে গোপালের রক্তের গভীরে একটা দারুণ ভয় শিরশির করে উঠলো। চোখ বুজবার আগে অল্প আলোয় গোপাল দেখলো শেওলা রঙের জামা প্যান্ট পরা এক দঙ্গল লোক তার ভাঙা বাড়ির চারদিকটা বেড় দিয়ে আছে। হাতে একটা করে নল বাগিয়ে ধরা।

"সার্চ করো।"—উত্তেজিত গলায় হাঁকড়ে উঠলো ও. সি. সাহেব।

জনা পাঁচেক ঝাঁপিয়ে পড়লো গোপালের ভাঙা ঘরে। আর্ত চিৎকার করে গোপালের বউ উঠোনে আছড়ে পড়লো। বাচ্চাগুলি মাকে জড়িয়ে ধরে তারস্বরে কান্না জুড়ে দিলো।

ও. সি. সাহেব আবার ধমকে উঠলো, "অ্যাই মাগী, চুপ্ কর!"

ততক্ষণে গোপালের খানতিনেক ছেঁড়া কাঁথা মাদুর ছিটকে এসে পড়লো উঠানের জলে কাদায়। রাইফেলের বাঁটের ঘায়ে চুরমার হয়ে যেতে লাগলো মাটির হাঁড়ি কলসি। একদিকের বেড়া খুলে গেলো। এনামেলের সামান্য থালা বাটিগুলি তুবড়ে গেলো বুটের লাথিতে।

হঠাৎ উত্তেজিত মল্লিক ছুটে এলো। হাতের মধ্যে কি একটা দলা পাকানো জিনিস।

"দেখুন স্যার, দেখুন!"

"কি ওটা?"—ও. সি সাহেব আবার ভুরু কোঁচকালো।

টর্চ ফেলে হাতের দলা পাকানো কাগজটাকে টানটান করে মেলে ধরলো মল্লিক।

"এই দেখুন স্যার, পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ। এই লোকটার বাড়িতে ম্যাপ থাকার কি জাস্টিফায়েড কারণ আছে? লেখাপড়া না জানা মূর্খ লোক! অথচ এই ম্যাপটা। এবার ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে লিঙ্ক্ করুন তো?"

"ইয়েস্—ইয়েস্!"—বিষম উত্তেজিত ভাবে মাথার টুপি খুলে আবার পরলো ও. সি. সাহেব।

"হাউ ডেন্জারাস্ ফর ডেমোক্রসি!"—ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে পুরলো মল্লিক।

"রাইট—রাইট !"

"ঠিক এজন্যই আমি স্যার, কোম্বিং অপারেশনের পক্ষপাতী। গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক মালগুলিকে সহজেই টেনে বার করা যায়।"

"ফোর্স উইথ্‌ড্র কর। চলো ব্যাক করি।"

"এই, চল্!"—একটা সবুট লাথি এসে পড়লো গোপালের পাছায়।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে গোপাল হাউ মাউ করে বললো, "এজ্ঞে মা কালীর দিব্বি, আমি কিছু করি নাই! উয়ারা সড়কি দেখালেক, আমি ছুট্‌টে পালালম। আমি কিছু করি নাই!"

"চোপ্!"

টেনে হিঁচড়ে ওরা গোপাল কাহারকে কালো গাড়িতে নিয়ে তুললো। গ্রামের ভিজে বাতাসে পেট্রোলের গন্ধ ছেড়ে পুলিশ মিলিটারির গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

গোপাল কাহারের বাড়িতে তখন কান্নার রোল।

"অ্যাই, তোর নাম বল্?"

গোপাল হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে বসেছিলো। তার পেটের জ্বালা এখন শরীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কপালের দু'জায়গা আস্ত সুপুরীর মত ফুলে গেছে। নিচের ঠোঁটটা বেশ কিছুটা কাটা। পাঁজরের কাছ থেকে একটু চিনচিনে ব্যথা বুকময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকটায় কিছুটা কান্নাকাটি করেছিলো গোপাল। দু'টো চোখই এখন চোত মাসের ডোবার মত খরখরে শুক্‌নো। যন্ত্রণার ফাঁকে ফাঁকে বউ ছেলেমেয়ের কথা ভাবছিলো গোপাল। আর সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না, তার দোষটা কোথায়।

"অ্যাই, তোর নাম বল্?"

সামনের টেবিল চেয়ারে সাব-ইন্‌সপেক্‌টর মল্লিক এবং ও. সি. সাহেব বসে আছে। টেবিলের অন্য দিকে ধোপ দুরস্ত জামা কাপড় পরা এক বাবু। মল্লিকের হাতে কলম। সামনে একটা লম্বা খাতা খোলা।

"এজ্ঞে, গোপাল কাহার।"—গোপালের গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ছিলো বলে তার আওয়াজটা খুব কর্কশ শোনালো।

তিনজন মুখ চাওয়াচায়ি করলো।

মল্লিক বললো, "এখনো বেটার তেজ দেখেছেন!"

টুপিহীন ও. সি. সাহেব তার মসৃণ টাকের উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে বললো, "গণতন্ত্রের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক !"

ধোপ দুরস্ত বাবু কেতা দুরস্ত গলায় বললো, "এদের ঠাণ্ডা না-করলে এদেশে গণতন্ত্রের বারোটা বাজলো বলে।"

সাত তাড়াতাড়ি ও. সি. সাহেব বললো, "আপনি ভাববেন না জগৎবাবু। এই সিসটেমে চললে কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাটাদের আমরা ঠাণ্ডা করে দেবো।"

গোপাল এসব কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলো না। গোটা ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে তার সরল মস্তিষ্ক আরো পারম্পর্যহীন হয়ে যেতে লাগলো।

"অ্যাই ব্যাটা, তোর আসল নামটা বল্ ?"—চেয়ার ঘুরিয়ে গোপালের মুখোমুখি হলো মল্লিক।

প্রশ্নটা মাথায় ঢুকলো না গোপালের। আসল আর নকল কি ! নাম তো তার একটাই ! কাটা ঠোঁট ফাঁক করে সে বোবা দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

"অ্যাই উল্লুক, তোর আসল নামটা বলতে পারছিস্ না ?"—মেঝের উপর অধৈর্য জুতো ঠুকলো মল্লিক।

"অজ্ঞে, গোপাল কাহার।"

"এটা তো নকল নাম। আসল নামটা কি ?"

"আমার বাপ এজ্ঞে, ঐ নামটিই রেখ্‌লো। গাঁয়ের লোক ডেকে শুধান কেনে ?"

"চোপ্, শালা ! রসিকতা হচ্ছে ?"

গোপাল আরো ঘাবড়ে গেলো। সে তো বাবুদের সঙ্গে রসিকতা করে নি। আর রসিকতা করার মত শরীর মনের অবস্থাও তার নয়। এবং অবস্থা থাকলেও পুলিশের সঙ্গে রসিকতার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

দাঁতে দাঁত চেপে চোখ ছোট করে ও. সি. সাহেব বললো, "দাওয়াই না দিলে এ শালাদের কাছ থেকে একটা কথাও বার করা যাবে না।"

মল্লিক চোখের ইশারা করতেই এতক্ষণ গোপালের দু'পাশে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকা সিপাই দুটো নড়ে উঠলো। সোজা দু'টো লাথি এসে পড়লো গোপালের পাঁজরে। 'আঁক্' করে একটা আর্ত শব্দের সঙ্গে মেঝের

উপর গড়িয়ে পড়লো গোপাল। দম বন্ধ হয়ে আসছিলো গোপালের। তার মধ্যেই কোন রকমে উচ্চারণ করলো, "বলছি এজ্ঞে, বলছি।"

মল্লিক কলম হাতে সোজা হয়ে বসলো। ও, সি. সাহেবের ক্রূর বাজপাখির মত ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গেলো।

হাঁ করে বড় বড় দম নিলো গোপাল। দম চাপা গলায় বললো, "এজ্ঞে, পেথমে বাপ আমার নাম রেখেছিলো আকাল। আমি যে সম হয়েলম সেবার আকাল ছেল কিনা, তাই।"

"তারপর সুযোগ মত আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য তুই নামটা পাল্টে নিলি, তাই না?—একটা ভুরুর মাথা হ্যাঁচকা টানে উপরে তুলে গোপালের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো মল্লিক।

"এজ্ঞে, আমি নয়, আমার মা। বইললে, ঐ অলুক্ষনে নামে ছেলেকে আমি ডাকতে পারবো নি। আজ থিকা ওকে আমি গোপাল বলে ডাকবো।"

গোপালের কথা শেষ হতে না হতেই টেবিল চাপড়ে ধমকে উঠলো ও. সি. সাহেব, "চোপরও উল্লুক। তোর পরিবারের ইতিহাস শুনতে বসিনি আমরা।" —তারপর ধোপ দুরস্ত বাবুর দিকে ফিরে বললো, "দেখছেন তো স্যার, কি রকম হারামি।"

বাবুটি ব্যাজার মুখে বললো, "এরাই গণতন্ত্রের সর্বনাশ করছে।"

"মা কালীর দিব্বি বাবু, আমি কারু সব্বোনাশ করি নাই।"

"না, সব্বোনাশ করি নাই! শালা তুমি একটি বাস্তুঘুঘু!"

গোঙানো গলায় গোপাল বললো, "বিশ্বাস করেন বাবু, আমি ওনার সব্বোনাশ করি নাই"

"কার?"—একটা নতুন কিছুর সম্ভাবনায় চমকিত ও. সি. সাহেব এবং মল্লিক টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লো।

গোপাল বললো, "ঐ যে—কি নাম বইললেন, গণতন্ত না কি। বিশ্বাস করেন বাবু, ওনাকে আমি চিনিও না। কুনদিন দেখি নাই। কোথায় থাকেন, তাও জানিনে!"

তিনজন আবার পরস্পরের দিকে তাকালো।

মল্লিক বললো, "কি রকম নিখুঁত অভিনয় করছে, দেখছেন তো স্যার?"—তারপর ঝটাং করে উঠে এসে চুলের মুঠো ধরলো গোপালের। বারকতক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, "তোর মত হারামির পেট থেকে কি করে কথা

টেনে বার করতে হয়, তা আমি জানি।"—তারপর একটা সিপাইকে বললো, "যাদব কো বোলাও।"

যাদব এলো। মুগুর ভাজা প্রকাণ্ড শরীর। চোখের ইশারায় গোপালকে দেখিয়ে মল্লিক বললো, "ইস্‌কো দেখা।"

দেখার মানে বোঝবার আগেই কাজ শুরু হয়ে গেলো। গোপালের বাঁ হাতটা পিছন দিক দিয়ে মুচড়ে আস্তে আস্তে চাপ বাড়াতে লাগলো যাদব। ক্রমাগত চাপে গোপালের মুখ বিকৃত হয়ে উঠতে লাগলো। মনে হচ্ছে, কাঁধ থেকে বুঝি হাতটা ছিঁড়ে আসবে।

খুব কঠিন, ক্রুদ্ধ গলায় বললো মল্লিক, "এবার বল বাবলা বনের ভিতর কি করছিলি তুই?"

যন্ত্রণায় কাতর গোপাল কোনক্রমে ককিয়ে ককিয়ে বললো, "এজ্ঞে, ওরা সড়কি দেখাতেই আমি বাবলা বনের ভেতর দে ছুট্‌টে এলম।"

"তুই খালি ছুটে এলি? কিছু করিসনি না?"

"না বাবু, আমি কিছু করি নাই!"

"তবে কে করলো?"

"কেউ কিছু করে নাই বাবু।"

"লোকটা অমনি পটাং করে মরে গেলো?"

"কেউ ত মরে নাই বাবু!"

শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে এ আর এক যন্ত্রণায় পেয়ে বসলো গোপালকে। এ-এক বিষম বিপদ হয়েছে তার। কি জানতে চাইছে এরা তার কাছে! দিকচিহ্নহীন এক অকূল পাথারে সে যেন হাবু ডুবু খাচ্ছে। হাত পা ছুঁড়ে যত সে উদ্ধারের চেষ্টা করছে, এরা তাকে ততই ঠেলে দিচ্ছে অতলে। মল্লিক ইশারা করতেই যাদব আবার হাতের চাপ বাড়ালো।

"আঁ—আঁ—আঁ!"—রক্তের মধ্যে যন্ত্রণাটা যেন ঝনঝনিয়ে বাজতে লাগলো গোপালের। বাজের মত ও. সি. সাহেব টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে বললো, "বল্, শুয়ারের বাচ্চা বল, কে কে ছিলো সেখানে? কারা কারা সড়কি দেখালো? তাদের নাম কি?" হাতের যন্ত্রণা শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে টনটন করে বাজছে গোপালের। তার বিস্ফারিত চোখের ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে অন্ধকার ঢুকে যাচ্ছে। আর তিনটে হিংস্র জানোয়ার যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে মুখ বার করে কান ফাটানো গর্জন করছে, নাম বল, তাদের

নাম বল্! অজ্ঞান হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে গোপাল কোনক্রমে উচ্চারণ করলো, "প্রসন্ন হালদার!"

ঘরে বজ্রপতন হলেও বোধ হয় এত বিস্ময় হোতো না। তিনজন তিনজনের দিকে তাকালো। হারামজাদা বলে কি! প্রসন্ন হালদার। লোকটা যে কত বড় শয়তান এবং ফেরেব্‌বাজ তা বুঝতে আর কারু বাকি থাকলো না। তা না হলে প্রসন্ন হালদারের মত লোককে এর সঙ্গে জড়াতে চায় বেটা!

মল্লিক বললো, "দেখলেন তো স্যার, কত বড় ঘুঘু!"

ও. সি সাহেব নাভীমূল থেকে একটি শব্দ পরিত্যাগ করলো, "হুম্!"

ধোপ দুরস্ত বাবু খুব সাবধানে একটা সিগারেট ধরিয়ে, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, "ন্‌না, এদেশে গণতন্ত্রের মরার আর বেশি বাকি নেই!"

কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি ও. সি. সাহেব বললো, "কিছু ভাববেন না স্যার, গণতন্ত্রকে আমরা বাঁচাবোই।"

বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলো। তারপর চলে যাবার আগে বেশ থিয়েটারি ঢঙে বললো, "মনে রাখবেন, আমাদের গণতন্ত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র।"

শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত মল্লিক হাঁক দিলো, "পানী লে আও।"

বালতি করে জল এলো।

'মুখে ঝাপ্‌টা লাগাও!"

গোপাল কাহারের চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা চললো। ও. সি. সাহেব আর মল্লিক টিফিন সেরে এলো বাইরে থেকে। এটা আর কিছু নয়, গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য নতুন উদ্যম গ্রহণ মাত্র।

"কিরে, জ্ঞান ফিরলো?"

"থোরা থোরা সাব।"

যাদবের পরিচর্যায় আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরছিলো গোপালের। আসলে ঝাপ্‌টার জল তার হাঁ-করা মুখের ভিতর দিয়ে ঢুকে মরুভূমির মত শুকনো কণ্ঠনালীকে ভিজিয়ে পাকস্থলীর হা হা করা শূন্যতায় বিন্দু বিন্দু জমা হচ্ছিলো। আর তাই তাকে ক্ষুধা যন্ত্রণার মূর্ছিত অন্ধকার থেকে চেতনার নরক যন্ত্রণায় পৌঁছে দিচ্ছিলো।

হঠাৎ হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে বসলো গোপাল, "গণতন্তকে আমি চিনি না বাবু। উয়াকে কুনদিন দেখি নাই! কুথায় থাকে তাও আমি জানি না।"

"চোপ, শালা! ন্যাকা চৈতন!"—মল্লিক গর্জন করে উঠলো। তারপর ভাঁজ খুলে ম্যাপটা গোপালের চোখের সামনে মেলে ধরে বললো, "এটা কী?"

গোপাল কোন জবাব দিলো না। সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। দু'এক বার চেষ্টা করেও বাঁ হাতটা নাড়াতে পারলো না গোপাল। মনে হলো, হাতটা শরীর থেকে বাদ চলে গেছে। যাবার আগে তার কোষে কোষে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে একটা যন্ত্রণার বিষ। সেই বিষ তার শরীরময় চক্কর দিয়ে ফিরছিলো। মুচড়ে মুচড়ে উঠছিলো তার দেহটা।

হাতের রুল দিয়ে গোপালের কপালে একটা ঠোক্কর মেরে মল্লিক আবার চেঁচালো, "বল্, এটা কি?"

ভাঙা ঘরঘরে গলায় গোপাল বললো, "কাগজ।"

"কাগজ! হারামি, তুই জানিস না এটা কি? ম্যাপ দেগে সারাদেশে গণতন্ত্রের বারোটা বাজাচ্ছিস, আর এটা কি তা জানিস্ না!"

ও. সি. সাহেব বললো, "কোথায় পেয়েছিস্ এটা?"

"অ্যাঁ!"—চোখ দুটো কে যেন জোর করে বুজিয়ে দিচ্ছে গোপালের। সে প্রাণপণে টেনে খুলে রাখতে চাইলো।

"কোথায় পেয়েছিস্ বল?"—ও. সি. সাহেবের প্রকাণ্ড গর্জনে আশরীর চমকে উঠলো গোপাল।

"এজ্ঞে আমার দশ বছুরে ছেলে নে এয়েছিল ইচকুল থিকে।"—আচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে গোপাল বিড়বিড় করে বললো।

"কেন?"

"ইচকুলের বাগান থিকে পিয়ারা খেয়েছিলো,—দপ্তরী কুঞ্জ মেরেছিল উয়াকে।"—থেমে দম নিয়ে ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে গোপাল বললো, "ছোট ছেলে—সেই রাগে ইচকুল থিকে সরিয়ে নে এয়েছিল ওটা।"

"শালা ঘুঘু, এখনো গল্প বানিয়ে আমাদের বুদ্ধু বানাচ্ছিস্! হারামি!"—মল্লিকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। মহান গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সে রুল হাতে গোপাল কাহারের শীর্ণ শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পরিশ্রান্ত মল্লিক এক সময় কপালের ঘাম মুছে উঠে দাঁড়ালো। হাতের রুলটা টেবিলের উপর রেখে বললো, "নে, এটাকে লক্-আপে ঢোকা।"

থানার লক্-আপে তিনটে ছিঁচকে চোর, একজন গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার, দু'জন ভবঘুরের সঙ্গে গোপাল কাহারের মূর্ছিত দেহটাকে নামিয়ে রেখে গেলো কনেস্টবলেরা।

আর এমনই অদ্ভুত ব্যাপার, থানা লক-আপের লোহার গরাদ ডিঙিয়ে পরদিন ভোরের প্রথম আলো গোপাল কাহারের জ্বরে আতপ্ত, ব্যথায় জর্জরিত লাঞ্ছিত দেহের উপর এসে পড়লো। এত সব কাণ্ডের পর তার মৃত্যু হওয়াই উচিত ছিলো! কিন্তু গোপাল কাহার কি সহজে মরে? জন্ম থেকে তাকে ক্ষুধায় মারছে, প্রকৃতি মারছে, কুচক্রী মানুষ মারছে। মারের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ সহজাত।

আর সেই সহজাত প্রতিরোধেই সে স্যাঁতসেঁতে মেঝে থেকে মাথাটা ইঞ্চি দু'য়েক তুলে কোন মতে উচ্চারণ করলো, "জল।"

এক কোনায় একটা পুরানো বালতিতে কে জানে কতদিনের বাসী ময়লা জল পড়েছিলো। গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার অতিকষ্টে উঠে গিয়ে, কেননা তারও শিরদাঁড়াটা ব্যথায় টনটন করছিলো, একটা মাটির ভাঁড়ে করে সেই জলই গোপাল কাহারের মুখের সামনে ধরলো।

জল খেয়ে গোপাল মাথা গুঁজে রইলো। এর মধ্যেই তার মনে হলো, যে জল দিলো সে কালকের মত কেউ নয়। ভিন্ন মানুষ। আর তখনই গোপাল একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলো, "গণতন্ত কি বাবু?"

গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার হকচকিয়ে গেলো। এ আবার কি অদ্ভুত ব্যাপার। গণতন্ত্র! এ-সময়! এখানে!

গোপাল তার প্রকাণ্ড ফোলা মুখ, থুত্‌নির কাছে জমাট বেঁধে থাকা রক্ত, কাটা ঠোঁট নিয়ে আবার বিড়বিড় করে জিজ্ঞাসা করলো, "গণতন্ত কী বাবু?"

প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার কি ভাবলো কে জানে। কয়েক মুহূর্ত স্থির অপলক চোখে গোপালের বিপর্যস্ত দেহের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর কেন জানি একটু ম্লান হেসে বললো, "গণতন্ত্র! সকলে সমান ভাবে খেয়ে পরে বাঁচবে, দেশে ন্যায় অন্যায়ের বিচার থাকবে, সবাই স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করতে পারবে তার নামই গণতন্ত্র।"

গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে গোপাল আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লো।

অবশেষে দীর্ঘ সাত মাস অতিক্রান্ত হইবার পর বিনা বিচারে বন্দী গোপাল কাহার সদর জেলখানা হইতে মুক্তি পাইল। তাহার বাঁ

হাতখানি কাটিয়া বাদ দিতে হইয়াছে। বাহিরে আসিয়া বড় বড় করিয়া সে নিশ্বাস টানিল। সম্ভবত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, যে বায়ুমণ্ডল এবং সূর্যালোক সে ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহা এখনো সেই রূপই আছে কিনা।

সে সিদ্ধান্ত করিল, প্রথমে বাড়ি যাইবে। বউ ছেলে মেয়ের বাঁচা মরার সংবাদ লইবে! তাহার পর সোজা সমিতির অফিসে।

কেননা, সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, যে গণতন্ত্রের জন্য সে বাঁ হাতখানি সেলামী দিয়াছে, সেই গণতন্ত্রকে ভাঙিয়া সকলের ব্যবহারযোগ্য একটা নতুন গণতন্ত্রের জন্য সে তাহার দক্ষিণ হাতখানিও সেলামী দিবে॥

জলপোকা

সমরেশ দাশগুপ্ত

আকাশে অকাল বর্ষণের অন্ধকার মুখ উঁকি না দিলে হয়তো শীতটা এতদিনে বিদায় নিত। বৃষ্টির জলে শহরতলিব এই অরবিন্দ কলোনির গাছপালা, ইট বিছানো রাস্তা, বাড়িঘর সব কেমন ধুয়ে মুছে বিষণ্ণ হয়ে আছে। রোববার পযন্ত এমন আবহাওয়া চললেতো গোটা আয়োজনটাই মাঠে মারা যাবে। দেয়ালে দেয়ালে রাজনৈতিক পোস্টারের পাশেই পোস্টার পড়ে গেছে: "আগামী রবিবার বিকেল চারটেয় সামন্তের মাঠে হাজির হচ্ছেন এ যুগের বিস্ময়কর প্রতিভা মাস্টার জাদু। দেখুন কেমন করে মানুষটি জলের ওপর দিয়া অনায়াসে হেঁটে যান"—বৃষ্টির জলে পোস্টারের লেখা ধুয়ে মুছে ঝাপসা হ'য়ে আসছে!

এবং দুপুরের দিকে বৃষ্টির মাত্রা কমে এলে শানুর মুখে হাসি ফুটল, শালা আকাশটা মাইরি নতুন বউয়ের মতো হাসছে যেন।

—আস্তে বল্, লজ্জাবতী আবার বেঁকে বসে যদি? পল্টন কেমন বিজ্ঞের মতো হাসল, ভালোয় ভালোয় আমাদের শোটা হয়ে গেলেই হয়।

পুরন্দর ঘোষালের মডার্ন লণ্ড্রীতে বসে ওরা এসব কথাবার্তা বলছিল। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ছিল। পুরন্দর আগে যে কারখানায় কাজ করত সেটা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাকে মাছ বিক্রি থেকে শুরু করে সিনেমার টিকেট চেকার, বাস কণ্ডাক্টারের কাজ পর্যন্ত করতে হয়। অবশেষে এই মডার্ন লণ্ড্রী। এখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈঠক জমায় শানু মুখুজ্যে আর পল্টন দত্ত। মাথায় বড় বড় চুল, লম্বা জুলপির বহরটা দারুণ, পরনে চক্কর বক্কর মার্কা হাওয়াই শার্ট, ট্রাউজারটা গায়ের চামড়ার সঙ্গে যেন সেঁটে আছে। কথায় কথায় সিনেমার গান গায়, মাঝে মধ্যে দেখা যায় অরবিন্দ কলোনির রাস্তা দিয়ে নেশার ঘোরে টলতে টলতে চলেছে। বলে, আমরা মস্তানের ভূমিকায় অভিনয় করছিনা, আমরা হলাম রিয়্যাল মস্তান! সুকর্মের কৃপায় ওদের ভাগ্যে শ্রীবাসও জোটে!

হিমাদ্রি হয়তো স্ত্রীকে বলে, ছেলেদুটো দিনে দিনে কেমন রাফ্ হয়ে যাচ্ছে দেখছো? সুতপা হয়তো বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, যেমন দিনকাল পড়েছে, এই দুনিয়ায় আমরা সবাই কেমন রাফ হয়ে যাচ্ছি না? হিমাদ্রি বলে, পল্টনটাতো কিছুদিন বার্লি ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের বডিগার্ডের কাজ করেছে। আর শান্টুটা লটারীর টিকেট বিক্রির ছুতো ধরে লোকের কাছ থেকে জুলুম করে টাকা আদায় করত। দুটি যেন সাক্ষাৎ বহুরূপী!

এখন দুই মস্তান রিক্শায় মাইক নিয়ে অ্যানাউন্স করতে করতে অরবিন্দ কলোনি পরিক্রমা করছিল। ওদিকে রোদের পিচকিরি থেকে সমস্ত আকাশেই আলোক রেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।

: মনে রাখবেন সামনের রোববার সামন্তের মাঠে এ যুগের বিস্ময়কর প্রতিভা মাস্টার জাদু জলের ওপর দিয়ে হেঁটে আপনাদের অবাক করে দেবেন। এ সুযোগ আপনারা হাতছাড়া করবেন না। দক্ষিণা মাত্র পঞ্চাশ পয়সা, বাচ্চাদের পঁচিশ পয়সা। মনে রাখবেন একটি নাম "মাস্টার জাদু" একালের বিস্ময়কর··

এদিকে অনুষ্ঠান করার জন্য মাঠের অনুমতি যদিও আগেই ওরা নিয়েছে কিন্তু পাড়ার ছেলেরা নাছোড়বান্দা।

—জলের ওপর দিয়ে হাঁটবেনা ছাই, এসব পুরা চারশো বিশ। বিদ্রূপের হাসি হেসে পল্টন বলল, মাফ্ করবেন দাদা। আমরা জেনেশুনে বিষ পান করিনা। মানে চারশো বিশের কথা বলছি আর কি! সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল, চলবেনা চলবেনা।

পরে রফা হ'ল অনুষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ টাকা থেকে ওরা সামন্তের মাঠের সংস্কারের জন্য খরচ করবে। কচুরীপানা ভরতি পুকুরটা ক্রমেই সামন্তের মাঠটাকে গ্রাস করছে। এবারে যদি কিছুটা উন্নত হয়। খেলাধুলোর আসরটাও ভালোই জমবে তাহলে। ছেলের দল উল্লাসে ফেটে পড়ে:

মাস্টার জাদু জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।···

সকাল থেকেই অরবিন্দ কলোনি সরগরম। মাইকে হিন্দি গানের অবিশ্রান্ত ফোয়ারা, মাঝে মধ্যে ঘোষণা: আজ বিকেলে দেখুন মাস্টার জাদু কেমন করে জলের ওপর দিয়ে হাঁটেন।

হিমাদ্রি ঘড়িতে দম দিতে দিতে অসন্তুষ্টের মতো বলল, একটা হুজুগ পেলেই হ'ল। এখন আবার জল নিয়ে জুয়ো খেলা হচ্ছে!

সুতপা রান্নাঘর থেকেই বলে উঠল, সবই মডার্ন লণ্ডীর ইচ্ছা!

দুনিয়ার মগজ ধোলাই হচ্ছে, অর্ডিনারি নয়, একেবারে যাকে বলে আর্জেন্ট···

যেন নাটকাভিনয়ের মতো, হিমাদ্রি দ্রুত সুতপার কথাটুকু শেষ করল, হিউম্যানিটি ফিউম্যানিটি সব ধুয়ে মুছে সাফ! কি বলো অ্যা? তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে হাসল কিছুক্ষণ। শেষে বলে উঠল, ভাগ্যক্রমে কি দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ ধোলাই ঘরটার বাড়িওয়ালা এখন আমরাই!

আসলে এই ঘরের মালিক ছিলেন হিমাদ্রির জ্ঞাতিভাই সত্যপ্রসন্ন। তার একমাত্র সন্তান লণ্ডনে ডাক্তারি পড়ছে। ওখানেই একটি ব্রিটিশ মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন। স্বদেশে আর ফিরবার ইচ্ছে নেই। সত্যপ্রসন্নের মৃত্যুর পর ঘরটার দায়দায়িত্ব সব হিমাদ্রির ওপরই এসে পড়েছে। এখন এর ভাড়া পঁয়ত্রিশ টাকা। পুরন্দর ভাড়া নেওয়ার পর ঠিকমতো ভাড়া পায়ওনা। তাগাদা দিলে পন্টন-শানু চোখ রাঙায়, ওকে বেশি ডিসটার্ব করবেন না, করলে আপনার লাশ মাটিতে পড়ে যাবে কিন্তু। হিমাদ্রি পুলিশে জানিয়েছিল, ফলে ওদের বাড়িতে কয়েকদিন ঢিল পড়েছে। সুতপা উষ্ণ কণ্ঠে বলেছে, পরের ধনে পোদ্দারি করে কি লাভ? দোকানের ভাড়ার আশা ছেড়ে দাও। একদিন পন্টন বলল, আপনাকে কেন ভাড়া দিতে যাবে পুরন্দর, দরকার হয় ও লণ্ডনের ঠিকানায় টাকা পাঠাবে। ওসব মামদোবাজি চলবে না দাদা!

টিকলু বাবাকে বলল, বাবা আমিও দেখব, দেখব কেমন করে মাস্টার জাদু জলের ওপর দিয়ে হাঁটে।

—চুপ কর। আমরা মরছি বলে আমাদের জ্বালায়। কারখানা কোন্‌দিন বন্ধ হয়ে যায় ঠিক আছে কিছু?

—বন্ধ হলেই হ'ল, টিকলু হাসল, ভেঙে ঢুকবে তুমি। সুতপা বলল, ঠিক আছে, যাবে, যাবে। হলোতো? সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি বলে উঠল, বললেই হ'ল? শেষকালে গোলমাল হবে, বোমাবাজি হবে। পুলিশ আসবে, ধরা পড়বে নিরীহ লোকগুলো।

সুতপা বলল, জানিনা বাপু, যাও।

দেখতে দেখতে আকাশে আবার মেঘের অবাঞ্ছিত কৃষ্ণপতাকা উড়ল। অবিশ্বাসী মানুষের জটলার মতো ভয়ঙ্কর সেই মেঘপুঞ্জ। হিমাদ্রি বলল, যাচ্ছো তাহলে? আকাশটা দেখে গেলে হতোনা?

—তোমারতো খালি ভয়। কবে বলেছি পুরন্দরকে তুলে দিয়ে ওখানে নাইটকে বসাও। পঁয়ত্রিশ টাকা করে আরো বেশি পেতে তাহলে।

—বলো কি, ওতো নামকরা ওয়াগন ব্রেকার!

—তাইতো বলছি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে। সেটা হবে সেয়ানায় সেয়ানায়।

—আর এদিকে আমার লাশটা পড়ে যাক আর কি।

স্বতপা নির্বাক। আর্ত কিছু দেখার মতো হতচকিত।

হিন্দি ফিল্মি গানার উৎকট ঝাঁজ সহ্য করে এক সময় সে বলল: তুমিতো কেবল আতঙ্ক বাড়াতে ওস্তাদ। একদিন তোমার ভাইটিও তোমাকে ছুবি দেখিয়ে বলেছে আমার পেছনে লাগলে এটা তোমার বুকে বসাবো। সেই নীলাদ্রি, নীলু, সুন্দর ছবি আঁকত, মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তে পারতো, ইংরেজিতে পদ্য লিখত। এখন কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে। কাগজে খুনজখমের খবর পড়ে, রাজনীতির শিকার। প্রথম প্রথম বলতো: দেখি নামটা, নীলাদ্রি মিত্র নয়তো? না, এখনও একেবারে নিস্পৃহ হয়নি হিমাদ্রি। মাঝে মাঝে বুকের ভেতর কান্না মোচড় দেয়—সন্ত্রাসের রাজত্ব আত্মঘাতী রাজনীতি—এইসব শব্দগুলি তখন বুকের গভীরে পায়রার মতো বকম্ বকম্ করতে থাকে অবিরাম।

এখন টিকলুর আর গান শুনতে ভাল লাগছে না। শুধু দেখছিল মা আর বাপীকে। বাপীকে গম্ভীর দেখলে বুঝতে হবে রাগ করেছেন। মাটা যেন কি. বাপীকে শুধু কষ্ট দেয়। শুধু টাকা আর টাকা।

বিকেলের দিকে আকাশটা সকল কালিমা ধুয়ে মুছে এখন যেন সুশীল বালকের মতো। অল্প অল্প রোদের ঝিলিক নারকেল গাছের পাতার ঝালরে। পুকুরের যেখানটায় মাস্টার জাদু হাঁটবেন সেখান থেকে কচুরীপানা তুলে নেওয়া হয়েছে। কালো জল তির তির করে কাঁপছে। সামন্তের মাঠের সকল সবুজ সত্তা এখন অনেক মানুষের ভিড়ের তলায় হারিয়ে গেছে। ভিড় সামলাবার জন্য মস্তানের দল আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওদিকে কথায় কথায় একদল তরুণ উগ্র হয়ে উঠল। তারা ঢিল ছুঁড়তে লাগল তাঁবু লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর। হই-হল্লা, চিৎকার।

মাইকে ঘোষিত হল: আপনারা শান্ত হোন। আর কিছুক্ষণ পরেই ওস্তাদজি আপনাদের সামনে আসবেন। গোলমাল চললে তাঁর মুড

নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে খেলা দেখাতে দেখাতে একটানা একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জনতার মধ্যে থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠল, আজকের এই অনুষ্ঠান যুধিষ্ঠির তরফদারের উদ্বোধন করার কথা ছিল।

—না তিনি অসুস্থ। আসতে পারবেন না। পল্টন জবাব দিল।

—অসুস্থ না ছাই। আমরা জানি তিনি ভয়ে আসবেন না।

—দেশনেতা না মুণ্ডু, দালাল এক নম্বরের। আরেকজন বলল।

—আমরাতো জানি ঐ দালালটা এবার ইলেকশনে দাঁড়াবে।

—আচ্ছা মুশকিলতো, এর মধ্যে আবার ইলেকশেন পার্টি এসব টানছেন কেন? শান্তু গোঁফে তা দিতে দিতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

বোঝা যাচ্ছে বাতাস ক্রমেই তেতে উঠছে।

এদিকে টিক্‌লুকে নিয়ে সুতপা না এসে পারেনি। হিমাদ্রিও এসেছে। এখন সে মেন্‌ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মস্তানদের ক্রিয়াকলাপ উপভোগ করছিল। কেউ গান গাইছে মাইকের গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, কেউ বা সিটি দিচ্ছে, টুইস্ট নাচছে।

—শালা পাম্‌ এভিনিউর হেমা মালিনী এসেছে। শরীরতো নয় যেন ফুলবাগান।

আরেকজন বাউল গাইল: খা'বি যদি বাগানের ফল—
গৌরপ্রেমের বাগান দেখতে চল!

—এ যে যাচ্ছে স্টুডিবেকার। মাইরি একটা জিনিস মিস্‌ করলাম রে!

—আঃ তোর মালগাড়িটা এমন বুকে দাগা দিয়ে উড়ে যাবে মাইরি?

—মালগাড়ি নয়, বল্‌ Sexpress Train···শরীরের মাপ চাই?

গাটা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে উঠল হিমাদ্রির। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। বমি বমি লাগছে। তখন সিঙ্গারা দুটো না খেলেই বোধ হয় ভাল হতো।

টিকলু কখনো আনন্দে নাচছিল, কখনো বা ভয়ে চুপসে যাচ্ছিল বেলুনের মতো। এত পুলিশ কেন মা? ওরা কি গুলি চালাবে?

ওদিকে কিসের শব্দ? বোমা ফাটল নাকি? বাপী কোথায় মা?

—আপনার মেয়ে জামাই কি জার্মানিতে চলে গেছে?

—না, গাঙ্গুলী গিন্নি উত্তর করল, জামাই একাই গেছে।

—মেয়ে গেলনা তাহলে ?

—না, রত্নার এখন জাহাজ আর প্লেনে চাপা ডাক্তারের নিষেধ। আসলে গাঙ্গুলী গিন্নি যে মিথ্যে কথা বলছে সুতপা সেটা জানে ভালভাবেই। মেয়ে-জামাইর মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে গেছে সুতপা সে খবরও রাখে। এখন ডাক্তারের দোহাই দিচ্ছে! গাঙ্গুলী গিন্নি বলল, আপনার ভাইপোর খবর পেলেন কিছু ? ও কি পলিটিকস করছে, না কি ওয়াগন ব্রেকারদের পাল্লায় পড়ে গেছে ?

সুতপা এমন ভাব করল যেন শুনতে পায়নি কথাটা।

শুধু বলল, কি সব বিশ্রী বিশ্রী গান বাজাচ্ছে ওরা বলুন তো ?

টিকলু অবাক হয়ে দেখল গ্যাসে ভরতি অনেকগুলো বেলুন কারা যেন আকাশে উড়িয়ে দিয়েছে। সহসা একটি তরুণী বলে উঠল, দেখছিস উড়ছে ?

আরেকটি তরুণী বলল, দেখছি তোর প্রেমিকের কীর্তি। উড়ছে তোর ভালবাসার নিশান।

—অঞ্জনকে তুই চিনিস ?

—চিনবোনা আবার। আসানসোল স্কুটার রেসে ও যখন ফার্স্ট হয় তখন আমি ওখানে।

—আর তুমি যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো ? দার্জিলিং-এর কমলা লেবুটি দিব্বি রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছো। কি যেন নাম কমলালেবুর ? অমিতাভ।

—ইস্ জিভ দিয়ে যেন জল গড়াচ্ছে মেয়ের। জিভে কামড দিয়ে গাঙ্গুলী গিন্নি সুতপার দিকে তাকাল।

—চলুন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। কী ভীষণ বেশরম মেয়েগুলো! কথা আর বেশভূষার কি ছিরি!

হিমাদ্রি শুনল পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলছেন, আমিতো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে মশাই, শুধু মানুষের মাথা ছাড়া।

—ও দাদু দেখতে হবেনা, বাড়ি চলে যান। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের লাইন দেখেননি ? কলেজে ভরতি হওয়ার লাইন ? ‘পাত্রী চাই’ বিজ্ঞাপনের লাইন ? এ দুর্দিনে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা কি ভীষণ শক্ত, এর চেয়ে জলের ওপর দিয়ে হাঁটা অনেক সহজ বুঝলেন, অনেক ইজি।

এমন সময় মাইকে করুণ কণ্ঠে ঘোষিত হল: আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এইমাত্র খবর পাওয়া গেল—মাস্টার জাদু কোলকাতায়

আসার পথে ট্রেনে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। আমরা এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত। ঠিক করেছি আজকের এই অনুষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ কিছু টাকা পরলোকগত মাস্টার জাদুর পরিবারবর্গের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এখন আসুন আমরা তাঁর আত্মার শান্তির জন্য দু মিনিট নীরবতা পালন করি।

কয়েক মিনিট স্তব্ধতা। সহসা গর্জে উঠল বিশাল জনসমুদ্র।

—এসব আগে থেকে প্ল্যান করা জিনিস। মাস্টার জাদু নয়, মরণ ঘনিয়ে এসেছে শালা তোদেরই।

—মার শালাদের...।

—পেঁদিয়ে লাশ বানিয়ে দে।

ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ভিড়ের মধ্যে কে একজন লোহার রড বসিয়ে দিল পুরন্দরের মাথায়। ঝলসে উঠল অসংখ্য ছুরি। দুমদাম ফাটছে বোমা।

ওদিকে টিকলুকে কোলে নিয়ে ছুটছে সুতপা। জোরে ছুটতে গিয়ে একটি তরুণী জলকাদার মধ্যে পড়ে গেল। কোথা থেকে এক মস্তান এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তরুণীর শরীরের ওপর। একজন বৃদ্ধ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল মস্তানটি ছুরি বের করতেই ভয়ে চিৎকার করে সুতপা ছুটতে লাগল। বৃদ্ধটিও।

ছুটতে ছুটতে হিমাদ্রি দেখল তার পাশের ভদ্রলোকের হাতঘড়িটি এইমাত্র ছিনতাই হয়ে গেল। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে নাকি? দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। ইতিমধ্যে আকাশে অনেক কালো মেঘ কেমন এক দল কালো দস্যু হয়ে জটলা শুরু করে দিয়েছে।

রাত অনেক হয়েছে। কিন্তু হিমাদ্রি ফেরেনি এখনো। সন্ধ্যে থেকেই পাড়াটা থম থম করছে! পুরন্দরের অবস্থা নাকি আশংকাজনক। এখন আছে হাসপাতালে।

—মাস্টার জাদুকে কারা খুন করল মা? টিকলুর জিজ্ঞাসা।

—জানিনে। যত সব লোক ঠকানো ব্যবসা।

সুতপার চোখের সামনে বিকেলের লণ্ডভণ্ড দৃশ্যটা আবার ভেসে উঠল।

—বাপী এখনো আসছে না কেন মা? বাপী না এলে যে আমি ঘুমতে পারবোনা।

স্বতপার বুকের ভেতরটা দপ্‌ দপ্‌ করতে লাগল। ভয়, দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক এইসবগুলো আজকাল মানুষের নিত্যসঙ্গী নাকি ? চতুর্দিকে অস্থিরতার আবর্ত। হঠাৎ কড়া নাড়া শুনেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল টিকলু, বাপী এসেছে মা, বাপী।

স্বতপা দরজা খুলতেই দেখল স্বামীর গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ।

—এত দেরি হ'ল যে ?

হিমাদ্রি নিরুত্তর।

—পুরন্দর নাকি বাঁচবে না শুনলাম ?

এই প্রশ্নেরও কোন জবাব না দিয়ে হিমাদ্রি দ্রুত বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিল, দিয়ে বলল, রাত অনেক হয়েছে, টিকলুকে ঘুমতে বলো। এই সময় স্বতপার হঠাৎ মনে পড়ে গেল বড়দার মেজ ছেলেটির মুখ। বল্টু। বি. এস সি পড়তো। হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে গেল। বছরখানেক পরে আবাব তাকে দেখা গেল। তখন তার মানসিকতায় প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছে, কেবলই বলে, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, শেষ করে দেবে, আমি এখন ঘুমবো, আমায় ঘুমতে দাও।

বাপীর গম্ভীর গলা শুনে ভয় পেয়ে গেল টিক্‌লু। তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ঘুমের ভান করল। শুনতে পেল বাপী বলছে, পুরন্দর সাড়ে আটটার সময় মারা গেছে। এই নিয়ে আবার পার্টিতে পার্টিতে লেগে গেছে। শানু আর পলটনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। কে জানে এই নিয়ে আবার কার্ফিউ টার্ফিউর মুখ দেখতে হয় কিনা। পাড়ার পার্টি অফিসগুলোতে দেখলাম পোস্টার লেখার হিড়িক পড়ে গেছে।

এখন টিক্‌লুর চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল, জুলুমবাজি বন্ধ হোক। শান্তি চাই, শান্তি চাই।

অনেকক্ষণ পর টিক্‌লু মাকে বলতে শুনল—দোকান ঘরটা তাহলে খালি হচ্ছে। বাঁচা গেল। একটু পরে বাপী বলল, ত্থাখো আবার কিছু ঝামেলা বাধে নাকি ! হিমাদ্রির বুকের ভেতরটা খচ্‌ খচ্‌ করছে, খারাপ খবরগুলো কেমন করে এখন স্বতপাকে দেওয়া যায়। আজ রাত্রে আর নয়, কাল সকালেই বলবে।

স্বতপা বলে উঠল, এবারে যে-ই আস্থক, সত্তর টাকার এক পয়সা কমে রাজি হবোনা, এই তোমাকে বলে রাখছি।

টিকলু চোখ বুজে ছিল বলে দুচোখে অন্ধকার দেখতে থাকল। অন্ধকারের ভেতর সে মাস্টার জাদুকে, পুরন্দরকে কাউকে খুঁজে পেলোনা। কিন্তু মা আর বাপী এখন টাকার হিসেব করছে কেন? দু-দুটো লোক খুন হয়ে গেল এর জন্যে তাদের কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না? আমারতো এখন খুব জোরে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে হিমাদ্রির কিছুতেই ঘুম আসে না। সুতপা বলল, এত ছটফট করছ কেন?

—জানিনা যাও, বলেই সে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল।

অনেক রাত্রে দুঃস্বপ্নের ভেতর হিমাদ্রি দেখল বিরাট জলাশয়। জলের রঙ পিচের মতো কালো। সেই জলাশয়ের ওপর দিয়ে হাঁটবার জন্য সবাই একের পর এক এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পারছেনা। তাই অসংখ্য লাশে ভরে উঠল পুষ্করিণী। আশেপাশে ছিল মুখোশধারী অনেক, নগ্ন তরুণ-তরুণী, তারা বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করছে, অশ্লীল সঙ্গীতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। হঠাৎ শোনা গেল সমবেত কণ্ঠস্বর: ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক। তারপরেই দেখল একটা ট্রাম গাড়ি ছুটে আসছে, ছুটে চলেছে জলের দিকে নয়, আগুনের ভেতরও নয়, চলেছে মহানগরীর রাজপথে একের পর এক সাজানো মৃতদেহের ওপর দিয়ে। ট্রামের আরোহী সকল পরস্পর এ ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নকে ফুটিয়ে তুলছিল।

হঠাৎ কঁক্ করে একটা আর্তনাদ উঠল। সুতপার ঘুম ভেঙে গেল আচমকা।

—তুমি ঠিক হয়ে শোও, কি রকম শব্দ হচ্ছে যেন। ঘুম ভাঙতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে হিমাদ্রির মনে হ'ল সুতপাকে দুঃসংবাদটা কি করে বলে। শুতে যাওয়ার আগে সে যখন পুরন্দরের মৃত্যুর খবরটা দিচ্ছিল তখন মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করছিল। সামন্তের মাঠে লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড। সবাই পালাতে ব্যস্ত। তখন ওয়াটার রিজার্ভয়াটার পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় কয়েকজন মস্তানের হাতে ধরা পড়ে হিমাদ্রি। সকলের মুখে মুখোশ।

—পুরন্দরকে ঘর ছাড়া করার জন্য তুই ওর পেছনে গুণ্ডা লাগিয়েছিলি। এখন বুঝি ওটা পার্টি অফিস করার ধান্দায় আছিস? তাহলে তুই মরবি কিন্তু। একদম খতম।

—বিশ্বাস করুন, আমি এসবের মধ্যে নেই।

—মাস্টার স্তাতুর নাম করে যে টাকাটা উঠেছে ওতে তোর কত শেয়ার আছে?

—না। এক পয়সাও নেই। বিশ্বাস করুন।

—ঐ টাকা নাকি দালাল পার্টির ফাণ্ডে যাবে?

—আমি জানিনা।

—কি জানিস তবে, নিজের নামটা জানিসতো?

—ওদিকে ভীষণ গোলমাল, আমি যাই।

—দাঁড়া। তোর ভাই নীলুটা কোথায়।

—কে জানে, আমি তার খোঁজ রাখিনা।

—মিথ্যেবাদী কোথাকার। আমরা জানি তুই কোন্ পার্টির সাপোর্টার। আমরা জানি অফিসের ইউনিয়নে তুই···

—থাক সাম্পান ছেড়ে দে, ওকে আমরা নজর রাখবো।

সুতপাকে কি এসব কথা বলা যায়? শুনেইতো কাঁদতে আরম্ভ করবে। এই সময় নীলুর করুণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সমস্ত মন জুড়ে দুঃখের শীতল স্রোত বয়ে গেল। হিমাদ্রির দিদি থাকে নর্থ ক্যালকাটায়। দিদির বৃদ্ধ ভাশুর পূর্ববাংলা থেকে পঞ্চাশ মাইল নৌকোয় চেপে, পায়ে হেঁটে এখানে এসে শয্যাশায়ী হন। এখন স্বাধীন বাঙলায় যাওয়ার জন্য মন তাঁর আকুলি বিকুলি করে। কেবলই বলেন, আমি দ্যাশে যামু। তরা আমারে সোনার বাংলায় রাইখ্যা আয়। একটু ভাল হতে নিজেই চলে যান পাশপোর্ট অফিসে। বিরাট লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় দেখাত পেলেন উলটো দিকের ফুটপাতে একটা লাশ পড়ে আছে। কিন্তু পথচারীদের কোন ভ্রূক্ষেপও নেই, নির্বিকার চলেছে তারা। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন বৃদ্ধ। এক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে ঐ বৃদ্ধ অমোঘ মৃত্যুপুরীর পাশপোর্ট পেয়ে গেছেন। খবর পেয়ে হিমাদ্রিও গিয়েছিল হাসপাতালে। ফেরার পথে সে গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে। বোমা বারুদ···পুলিশ···ছুটোছুটি। হিমাদ্রি স্পষ্ট দেখল রাস্তায় ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় কাতরাচ্ছে তরুণটি, রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর শরীর। চমকে উঠল হিমাদ্রি, ঠিক নীলুর মতো দেখতে। আহ, নীলু···অবিকল নীলু, হিমাদ্রি ভাবছিল

এগিয়ে গিয়ে দেখবে নাকি ? কিন্তু দুম্‌দাম্‌ বোমার আওয়াজ, চতুর্দিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। কে যেন আর্তকণ্ঠে বলল, আমরা কি সব স্ট্যাচু হয়ে গেলাম ? দূরে একটা প্রোসেশন যাচ্ছে, তারই সচকিত শ্লোগান, জুলুমবাজি চলবেনা... হত্যাকারীর শাস্তি চাই···বাঁচতে চাই বাঁচতে চাই...কোথায় মাইকে শানাই বাজছে, আজ কি বিয়ের তারিখ ? স্বরটা খুব চেনা চেনা···বসন্ত রাঙিল আজি আবীর লালে···জলের ওপর দিয়ে একটা মানুষের আজ হাঁটবার কথা ছিল, হা হা হা হা, সেই মুখোশের মুখগুলো...আহ্‌, অবিকল নীলুর মুখ···আবার বোমার শব্দ, রক্তের স্রোত...শ্লোগান বসন্ত রাঙিল আজি...ছেড়ে দে সাম্পান...ওকে আমরা নজর রাখবো...। সমস্ত বুক জুড়ে হিমাদ্রির এখন নীরব যন্ত্রণা। স্বপ্নের সেই ট্রামগাড়িটার কথা তার আবারও মনে পড়ল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে দুর্ঘটনার বারুদ ঝলসে উঠেছিল। হিমাদ্রিও দ্রুত ট্রামগাড়িতে উঠে পড়েছিল। ট্রামটার গায়ে বড় করে লেখা, হিংস্রতা বর্জন করুন, চকিতে উঠবার সময় সে দেখতে পেয়েছিল, আরো বুঝি কি সব লেখা ছিল, বেঁচে থাকুন, বাঁচতে দিন ? হবে হয়তো। এখন আবার ঘুমের ঘোরে দেখা সেই ট্রামগাড়িটা শব্দের ফোয়ারা তুলে অতি দ্রুত ধাবমান—জলের দিকে নয়, আগুনের ভেতরও নয়, ছুটে চলেছে ট্রামলাইনের ওপর একের পর এক সাজানো মৃতদেহের ওপর দিয়ে।

বাকি রাতটুকু বোধ হয় না ঘুমিয়েই কেটে যাবে হিমাদ্রির। ঘরের ভেতর ঘুরছে ফিরছে শব্দের জোনাকি পোকা, ওকে আমরা নজর রাখবো, রাখবো, রাখবো, শুনতে পাচ্ছে হিমাদ্রি, ঘড়ির টিক টিক শব্দের মতোই।

এখন, ভোরে অস্ফুট আলোয়, হিমাদ্রি ছিন্ন-বিবর্ণ বিছানা দেখছিল। দেখছিল নোনা ধরা দেয়ালের বুকে বন্দী তুলোর শ্বেত পারাবত, সুতপা এই কাজটা বিয়ের বছরেই করেছিল, এখন ধুলো বালি লেগে বিবর্ণ। দেখছিল ফাটল ধরা মেঝের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা অসংখ্য লটারীর পুরনো টিকেট। বাবার কাছ থেকে নিয়ে টিকলু এখন এগুলো দিয়ে খেলে। একেকটা টিকেটের ওপর কাঁচা হাতে টিকলু একেক রকম লিখেছে—বাবা টাকা পায় নাই...মা কাঁদিতেছে কেন ?...বাবা বলিল খবরের কাগজে শুধু খুনের খবর থাকে···ইস্কুল-কলেজ কারখানা সব বন্ধ···আজ হাসপাতালে ধর্মঘট···

এসব দৃশ্যাবলীর ভেতর হিমাদ্রি বুঝি স্বপ্নের জিজ্ঞাসা চিহ্নটাকেও খুঁজে

পাচ্ছিল। কেমন বিশ্রী পোকার মতো দেখতে লাগে। ঠিক যেন একটা পোকা ; …ওকে আমরা নজর রাখবো, রাখবো, রাখবো।

দম দিতে দিতে ঘড়িটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হিমাদ্রি। কোনো কিছুর দিকে বহুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকলে চোখ দিয়ে জল না এসে পারেনা॥

জীবনযাপন

শচীন বিশ্বাস

সকাল বেলা সোনা গায়ে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিল, বাবা তোমার ছাত্র এসেছে, পড়াবে না ? বিছানায় কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকল মন্মথ। আ ও একটু ঘুমতে পারলে ভালো হত। দুই চোখেই পিচুটি পড়ে এঁটে আছে। কিছুদিন আগে চোখ উঠেছিল। লোকে বলে, চোখে জয়বাংলা হয়েছিল। গতকাল থেকে আবার জ্বালা করছে। সোনা বলেছিল, বাবা তোমার চোখ লাল হয়েছে। ডাক্তার বলেছিলেন, মাঝে মাঝে বরিক সেঁক দেবেন। আর বিশ্রাম। কি একটা চোখে লাগানোর মলম দিয়েছিলেন। বরিক কটন সে এনেছিল বটে কিছুটা, একদিন ছাড়া দু'দিন সেঁক দেওয়া সম্ভব হয়নি। কুসুম সারাদিন কাজে ব্যস্ত। ছেলেমেয়ে এবং সংসার। এর মধ্যে ওদের সকলেরই চোখ উঠে গেল। তুলোটা ওদের ব্যবহারে লাগল।

বাবা আবার ঘুমলে না কি ? সোনা তাড়া দিল, ওঠো—

মন্মথ উঠল। জোর করেই চোখের পাতা খুলল। টুথ পেস্ট ফুরিয়ে গেছে। লার্জ সাইজে এবার দু'মাসও গেল না! মনাটা ভারি দুষ্টু হয়েছে। দু দিন পেস্ট বের করে নষ্ট করেছে। দাঁত মাজা হল না। চোখ মুখ ধুয়ে মাথা আঁচড়ে কুসুমের পাউডার পাফটা নিয়ে পাউডারহীন অবস্থায় চোখ মুখের উপর বুলিয়ে ফ্রেশ হয়ে সে পড়াতে বসল।

ফ্রেজ্-ইডিয়মস্ দিয়ে নতুন বাক্যগঠন চলল কিছুক্ষণ। ভুল সংশোধন হল। ট্রানশ্লেসন করতে দিল।

চা এল। আজও এক কাপ। ছেলে দু'টি ট্রানশ্লেসন করছে ঘাড় গুঁজে। মন্মথ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বুঝতে পারল ভালো চা-ও আর নেই। পাড়ার মুদিখানা দোকানের চা কেমন যেন পেঁপে পাতা সেদ্ধ মনে হয়। মন্মথ বলল, তোমাদের চা বোধহয় হল না শ্যাম ; চিনি শর্ট। রেশনে সপ্তা দু'য়েক ত চিনি আসছেই না—

শ্যামসুন্দর একটা বাক্যে কর্তা লিখে হ্যাভ হবে না হ্যাড হবে ভাবছিল। বলল, আমরা চা খেয়েই এসেছি স্যার, আপনি খান—

চা খেতে খেতে মন্মথ ভাবল, শ্যামসুন্দর বেশ বলেছে। চা তারা খেয়েই এসেছে, সুতরাং আরেক পেয়ালার প্রয়োজন খুব একটা নেই। নিতাই হঠাৎ বলল, চিনি ত স্যার, রেশনে আর দিচ্ছে না, ওপন্ সেল হচ্ছে; অবশ্য দামটা একটু বেশি। দু টাকা পনের কুড়িতে পাওয়া যাচ্ছে—

তাই না-কি! কখন যে কি হচ্ছে তাল রাখাই মুশকিল। আসলে চিনির ওপন্ সেলের ব্যাপারটা মন্মথরও অজানা ছিল না। রেশনের উল্লেখ করে সে সহজ এবং স্মার্ট হতে চেয়েছিল ওদের কাছে। নিতাইটা অবশ্য অত ভেবে বলেনি। না-কি সেও টের পেয়ে গেছে মাস্টারমশায়ের বড় টানাটানি যাচ্ছে...

ভেতর-বারান্দায় দুধ খাওয়া নিয়ে কুসুম ও সোনার কথাবার্তা শুনতে পেল মন্মথ। সকালে এক পোয়া এবং বিকেলে এক পোয়া দুধ নেওয়া হয়। সকালে দুধ পেতে দেরি হলে বেবিফুড গুলে মনাটাকে দেওয়া হয়। সোনা তার ভাগ চায়। আজও সেইরকম কিছু ঘটে থাকবে। বেবি ফুডের কৌটোও প্রায় খালি। অন্যান্য মাসে ওদের জন্যে মন্মথ বিস্কুট কিনে আনত। ইদানীং স্কুলে পুরো বেতন নেই। সুতরাং মাস-কাবারী বাজার করা হয় না। টানাটানি সব দিকেই—

শ্যামসুন্দর খাতা এগিয়ে দিল। পাতাটা অপরিচ্ছন্ন, নোংরা এবং মারাত্মক সব ভুলে ভরা। অস্পষ্ট এবং তালগোল পাকান। মন্মথ কিছুক্ষণ ধরে পাতাটার অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করল। কিন্তু সে কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারছে না। একটা বাক্যও সরল সহজ পরিষ্কার নয়। হাতের লেখা হিজিবিজি, একটার ঘাড়ের ওপর আরেকটা শব্দ। অসংখ্য বানান ভুল। গ্রামারের নিয়ম-কানুন সে কিছুই মানেনি।...নাঃ, মনাটা খুবই বাড়াবাড়ি করছে। কুসুমই বা অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন! লাল কালিতে ভুল সংশোধন করতে গিয়ে গোটা প্যাসেজটাই প্রায় নতুন করে লিখে দিতে হল। নিতাই বলল, মাস্টারমশাই, আমি টুকে নি।

ছেলে দু'টি আবার ঝুঁকে পড়ল খাতার উপর। মন্মথ সামনের রাস্তার উপর দিয়ে ও-পাশে অনিলদের বাড়ি দেখল। অনিলের বোন শেফালী গাছের ডালে বসে পেয়ারা চিবচ্ছে। অনিলের বাবার কদিন থেকে কাজ

নেই। 'জয়বাঙলার' লোকেরা কাজে লাগাতে এবারে মাঠে নিড়ানির কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আবার কাজ হবে শ্রাবণ-ভাদ্রে, আউশ পাকলে। শেফালীর মা কুসুমের টুকিটাকি কাজ করে দিয়ে মাঝে মাঝে চাল-আটা নেয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। অনিল সেই যে গত সপ্তাহে কোলকাতায় গেঞ্জির কারখানায় কাজ করতে চলে গেছে আর আসেনি। সেখানে মালিক পক্ষের সঙ্গে লড়াই চলছে শ্রমিকদের। অনিলের বোন শেফালী পেয়ারা চিবচ্ছে। ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ল। বিশুর মা একদিন পেয়ারা সেদ্ধ করে ছেলেমেয়েদের খেতে দিয়েছিল। সেদিন ওরা কেউই ভাত খায়নি। পেয়ারা সেদ্ধ খেয়েছিল। কয়েকদিন হল বিশুরা সীমানা পার হয়ে এ-পারে চলে এসেছে। পাড়ার একটা পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ত। কলেরায় দু'তিনটি মারা গেল। একদিন সরকারী গাড়ি এসে 'জয়-বাঙলার' লোকদের তুলে নিয়ে চলে গেল।···শেফালী পেয়ারা চিবচ্ছে। বারো তেরো বছরের মেয়ে ভাতের বদলে পেয়ারা চিবচ্ছে ভাবতেও কেমন লাগে।

এক সময় শ্যামদের বই খাতায় ডুবে সব কেমন হারিয়ে গেল। কুসুম সংসার সোনা মনা অনিল শেফালী বিশু জয়বাঙলা সব একাকার।

কাগজ এল। নিতাই বলল, আজ তাহলে স্যার তার কাটা হয়নি, ট্রেন চলছে—

মৃদু হেসে মন্মথ কাগজটা টেনে নিল। বিশেষ কাজ না থাকলে এ-সময় শ্যামদের ছুটি। ওরা আজ বোধ হয় খেলার সংবাদ পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আজ জোর খবর ছিল। তিন মহাকাশচারীর মৃতদেহ নিয়ে সয়ুজ ১১ পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। পাশে জীবন্ত মুখের ছবি। যাওয়া আর আসার মধ্যে কী দুস্তর প্রভেদ! রাষ্ট্রপতির শাসন আসছে। মন্ত্রিদের তাহলে কি হবে! পাকিস্তানকে আমেরিকার সাহায্য—ছাত্র ধর্মঘটের ডাক। জনৈক মন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সমাধানের চ্যালেন্জ গ্রহণ। বঙ্গীয় রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। শ্যাম, দেখ কাগজে কি সব লিখেছে। আজ অনেক কিছু পড়ার আছে দেখছি। মন্মথ ঘরে ঢুকে একটা সিগারেট ধরালো।

ফিরে এসে দেখল শ্যাম খেলার পাতা পড়ছে। নিতাই পেয়ারা লুকলো। কিছুক্ষণ পরে ওরা যথারীতি উঠে গেল। মন্মথ টাকা চাইবে চাইবে মনে করেও চাইতে পারল না।

কিছুক্ষণ কাগজের উপরে হুমড়ি খেয়ে সমস্যা সমাধানের চ্যালেন্জ ইত্যাদি পড়ল। তারপর যখন শ্যামরা রাস্তায় নেমেছে, মন্মথ পেছন থেকে ওদের ডাকল। ওরা দু'জনেই দাঁড়াল এবং একটু এগিয়ে এলো, ডাকছিলেন স্যার? ওরা কি একটু হাসল! কেননা ওরা জানে মন্মথ এখন কি বলবে। টাকা চাইতে হলে বাইরে বের হয়ে, যেন হঠাৎ মনে পড়ল, পেলে ভালো হয়, না পেলেও চালিয়ে নেব—এমনি করে সে চায়। মন্মথ বলল, শ্যাম বাবাকে বলেছিলে? নিতাই, দাদা কবে ফিরবেন কোলকাতা থেকে?

পাওয়া গেল না। পাবে না জানত মন্মথ। মাসের ত সবে পয়লা। প্রশ্নই ওঠে না। গত মাসেরই পাঁচটাকা করে বাকি পড়ে আছে। শশধর বলে, বুঝলে মন্মথ, ছাত্ররা সব টাকাটাই গার্জেনদের কাছ থেকে নেয়, ওর থেকে দু'চার টাকা না মারলে বিড়ি সিগারেট খাওয়া আছে, সিনেমা দেখা আছে—মন্মথ অবশ্য অতশত ভাবে না। রিফ্যুজি এলাকা। পেটের ভাত জোগাড় করতে এখানকার মানুষ গলদঘর্ম। ইচ্ছা থাকলেও অনেকে সময়মতো মাস্টারদের বেতন দিতে পারে না।

শশধর তর্ক করে। মুদি শোধ চায়। গোয়ালা তার দুধের দাম পায়, কয়লা ঘুঁটের দাম মেটাতে হয় ঠিকঠাক। আর মাস্টারদের বেলায় আজ নয় কাল। আরে ছোঃ ঘেন্না ধরে গেল।

সকালে আজ উজ্জ্বল রোদ। সামনে রাস্তা। পেছনে তার আস্তানা। এখানে অনেক সমস্যা। সংসারের অনেক দাবি। আমি সমস্যা সমাধানের কোনো চ্যালেন্জ নিতে পারি না, ভাবল মন্মথ।

অন্যমনস্কভাবে বারান্দায় উঠে এলো। কাগজে অনেক খবর। আহা, ওরা ফিরে এলে বেশ হত। ওদের আত্মীয় স্বজনেরা নিশ্চয়ই আজ ভীষণ শোকাহত। মন্মথর মনেও এক প্রকারের শোক বিস্তারলাভ করতে লাগল। তিনজন মহাকাশচারী, বঙ্গীয় রণাঙ্গনে নিহত সকলের জন্যেই শোকাহত। মন্মথ আজকের সংবাদপত্র সামনে রেখে অনিলদের পোয়ারা গাছ (শেফালী পেয়ারা চিবচ্ছে—ক্ষুধাকে চ্যালেন্জ!) পেরিয়ে কোথায় যেন তাকিয়ে থাকল।

একটু পরে অজিত এল। যথারীতি কাগজে মন দিল। মন্মথ অজিতকে দেখল, কিন্তু সে চুপচাপ বসেই থাকল। একটু পরে অজিত কাগজ রেখে দিল। মন্মথ বলল, দেখলে?

দেখলাম—

পেলে না ?

ন্—নাঃ। মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানেন, মাস্টারমশাই, খেপে গিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলি— !

মন্মথ কোনো কথা বলল না। অজিত বলল, বাবা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আপনিই বলুন, চাকরি আমি পাচ্ছি কোথায় ?

তাড়িয়ে দিল মানে ?

বলল, বাড়িতে থাকা চলবে না—খেতে দিতে পারবে না, উপযুক্ত ছেলে উপায় উপার্জন করতে হবে।

তারপর ?

তারপর আর কি ? সার রাত স্টেশনে কাটিয়ে এই আসছি—

স্টেশনে কাটিয়ে দিলে ?

অসুবিধা কি ! সারা স্টেশন জয়বাঙলার লোকে ভর্তি। আমাদের গ্রাম থেকেও লোক এসেছে ! ওদের ওখানে আতপ চালের খিচুড়ি খেয়ে মাদুরের উপর শুয়ে থাকলাম। আমাকে কেউ সন্দেহও করল না আমি শরণার্থী নই। আজও যাব, বলে এসেছি—

না, অজিতকে কেউ সন্দেহ করবে না। ময়লা পাজামা এবং অল্প দামের হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি গায়ে। পায়ে একজোড়া ক্ষয়ে যাওয়া হাওয়াই চপ্পল। চুলে তেল নেই। চোখ কোটরাগত। পেট পিঠের সঙ্গে সর্বদাই সেঁটে আছে। লম্বা হাড় ক'খানা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। খুব ভালো করে লক্ষ্য না করলে ভারতীয় ত দূরস্থান, ও যে যুবক এটাই কেউ ঠাহর পরতে পারবে না।

কুসুম দু'প্লেটে দু'খানা করে রুটি-গুড় আনল। অজিত বলল, অক্ গ্রাণ্ড ! একটু চা খাওয়াবেন বউদি। ভদ্র কেরানীর মধ্যম সন্তান, চায়ের নেশাটা কাটতে চাইছে না—

রুটি চিবতে চিবতে অজিত বলল, এবার ঠিক পাশ করে যাব। আচ্ছা খাতা আবার অন্যভাবে দেখা হবে না ত ? আপনারা ত খাতা দেখেন—ওপর থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি—মানে এবার ত যথেষ্ট আনফেয়ারমিনস্ নেওয়া হয়েছে—

রুটি চা খেয়ে অজিত চলে গেল। মন্মথ কাগজে চোখ রাখল, পশ্চিমবঙ্গের সব সমস্যার সমাধান করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুস্থতা ফিরিয়ে

আনতে হবে! এত বড় একটা আশ্বাস বাক্য অজিত পড়ে দেখল না। বেচারা কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা দেখে দেখেই যৌবন শেষ করে দেবে নাকি!

কুসুম এলো পরপরই। বলল, বাজার যাবে, না ঝিম ধরে বসে থাকবে?

আপাতত বসে আছি, এর পরই যাব ভাবছি—

এখনও ভাবছ, বেলা কত হল?

কিন্তু যাই কি নিয়ে? শ্যামরা ত সেই পাঁচ টাকা করে আজও দিল না। দিলে ত বেশ হত।

কুসুম দু'টো টাকা ফেলে দিয়ে বলল, পড়াও কেন? পয়সাই যদি না পাওয়া যায় সে রকম ছাত্র পড়ানোর প্রয়োজন কি। লোক জানছে তুমি টিউশানি করছ, অথচ টাকা নেই, বাঃ—

ব্যাগ হাতে বের হচ্ছিল মন্মথ। কুসুম বলল, দোকান থেকে তেল আনতে হবে—তেলটা আগে দিয়ে যেও—

মুদিখানার শম্ভুকে তেল দিতে বলে মন্মথ খবরের কাগজটা দেখতে লাগল। সংবাদ একই। তবুও ত অন্য কাগজ। মন্মথর ধারণা খবরের কাগজ সভ্যতার সব চেয়ে বড় দান। কিন্তু তার দুঃখ হয়, বাঙলা ভাষায় এখন দু'টির বেশি তিনটি সংবাদপত্র নেই। বাঙলা দেশের উপর একটা ভালো আর্টিকেল দিয়েছে, দু'চার লাইন পড়তেই মন্মথর ভালো লাগল। কী সুন্দর এনালিসিস! লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্যে জঙ্গীশাহীই দায়ী লেখক তা দেখিয়েছেন। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল মন্মথ; হঠাৎ কি যেন একটা আলোড়ন টের পেল। (মুক্তি ফৌজ এগিয়ে চলেছে!) একজন অফিসার দ্রুত এগিয়ে এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটির হাত ধরে ফেলল। ছেলেটি দোকানে জিনিসপত্তর কিনছিল।

অফিসার বলল, এখানে এতগুলি ছেলে ছিল, গেল কোথায়?

আমি জানি না—

তোমার নাম কি?

সিদ্ধার্থ রায়—

বাঃ নামখানা ত বেশ। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন—

দু'জন রাইফেলধারী এগিয়ে এসেছিল। পেছন থেকে ওদের অস্ত্র দু'টি দেখছিল মন্মথ (আমেরিকার অস্ত্র সাহায্য!) ওদের মধ্যে একজন বলল, অসম্ভব নয় স্যার, ইউরোপে কুকুরের নামও শেকস্পীয়র রাখা হয়—

এই রাইফেলধারীর প্রতি বোধহয় অফিসার খুশি, একটু সমীহও মনে হল। সম্ভবত সে পড়াশুনো করে, খোঁজখবর রাখে। না হলে জানল কি করে ইউরোপে কুকুরের নামও—

তা সিদ্ধার্থ, কোন ক্লাশে পড়—

ক্লাশ নাইন সায়েন্স—

আমি ভাত খাই ইংরেজী বল।

ছেলেটি তো তো করতে লাগল। মন্মথ বুঝতে পারছিল, ছেলেটি বেশ ভয় পেয়ে গেছে। নাম বলা পর্যন্ত সে স্টেডি ছিল। কিন্তু সুকোমল মিথ্যে কথা বলল কেন? সত্যি সত্যিই ত সে তার নিজের নাম বলতে পারত—

বোম বানাও?

না।

না কি? আমি ভাত খাই ইংরেজি বল।

আই ইটস্ রাইটস্—

মন্মথ বিস্মিত হতবাক। চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না। সুকোমল তারই ছাত্র। সে-ই ওদের ইংরেজি পড়ায়। অথচ চোখের সামনে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে দেখল—

অফিসার বলল, তোমার দোকানে ছেলেরা আড্ডা দেয়?

মুদিখানার মালিক শম্ভু, এককালে নৈহাটির কোন চটকলের মজুর ছিল, বর্তমানে ছাঁটাই এবং বেকার, বাবার টিমটিমে দোকানটা দাঁড় করানোর জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করে, বলল, কই না ত, সদাই টদাই নিতে কেউ কেউ আসে। কেউ কেউ কাগজ পড়ে, কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে—

হুঁ? ছেলেদের আড্ডা হলে কিন্তু দোকান তুলে দিয়ে যাব। হঠাৎ মন্মথকে দেখতে পেয়ে বলল, আপনি কে?

মন্মথ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ্ঞে আমি একজন টিচার—

কোথাকার টিচার?

এখানকারই, এই ত স্কুল—

এই ছাত্রের শিক্ষক?

মন্মথ বলল, ও আমাদেরই ছাত্র—

অফিসার গোঁফের ফাঁকে মৃদু হাসলো। দেখলেন ত, কি শিক্ষা আপনারা দিচ্ছেন। মন্মথ কিছুই বলার পেল না। অফিসার সান্ত্বনা দেবার মতো করে

বলল, তা আপনাদেরই বা দোষ কি! ছেলেরা ত পড়াশুনো করে না। পড়ার সময়ই বা কোথায় তাদের। বোম-পটকা বানাতেই ত সময় চলে যায়।

অফিসার মন্মথর কাছে এসে অন্তরঙ্গ হওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধের উপর হাত রেখে এপাশে কাঁঠাল গাছটার দিকে টেনে আনল। মন্মথ বুঝতে পারল, লোকটা বেশ শক্ত করেই তার পাঞ্জাবির অংশবিশেষ চেপে ধরেছে। অফিসার ফিস্ ফিস্ করে বলল, মাস্টারমশাই, খবর টবর কিছু দিন—

মন্মথ বলল, কি খবর দেব বলুন—

ওরা ত সব অঞ্চলেই লুকিয়ে থাকে, জানেন না?

মন্মথ বলল, আজ্ঞে আমি ত কিছুই জানি না। ছাত্র পড়াই, স্কুলে যাই, পয়সা থাকলে বাজার করি, দেশের সংবাদ, এমন কি আমাদের এ-শহরের সংবাদ বা পাড়ার খবরও খবরের কাগজে পড়ি। আমার বিশেষ বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনও নেই—

রাইফেলধারীর দল অঞ্জনার তীরে আদিবাসীদের পল্লীর দিকে চলে গেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা কুকুর হঠাৎ বিকট শব্দে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। একটি ধুলিধূসর নেংটা ছেলে পুলিশ বলে হাত-পা ছুঁড়ল। সুকোমল তখনও দাঁড়িয়েছিল। নটু, শ্রীকান্ত, অনল প্রভৃতি কোথা থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হল। সুকোমল হাসছিল। শম্ভু বকবক করছিল। সুকোমল বলল, পুলিশকে কখনও সত্য কথা বলতে নেই, কেবল উলটো-পালটা বলতে হবে।

সুকোমলের চোখ-মুখ দেখে মন্মথ এতক্ষণে যথার্থ বিস্মিত হল। ওর চোখ-মুখে লজ্জা সঙ্কোচ বা ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। সে মন্মথকে বলল, আপনারাও স্যার, পুলিশকে কখনও সত্য কথা বলবেন না—

সে কি! কেন? কি বলতাম—শিক্ষকতা করি—

সুকোমল যেন একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, শিক্ষকতা করলে কি হয়েছে স্যার, আপনাদের উপর পুলিশের ভালো ধারণা আছে না কি?

মন্মথ বলল, আমাদের উপর ওদের কি ধারণা আছে তা জানি না—তা ছাড়া শিক্ষকতা করি একথা না বলে কি বলব?

যা মুখে আসে বলে দিতে হয়। যাহোক কিছু।

মন্মথ গম্ভীর হল। বলল, যাহোক কিছু কি রকম?

যেমন ধরুন রেশনের ডিলার, খবরের কাগজের রিপোর্টার, জয়বাঙলার

সেবক,মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, পাটের দালাল, সাহিত্যিক, হাসপাতালের মিল্‌ক সাপ্লায়ার—

উপস্থিত সকলেই হাসতে লাগল। মন্মথ হাসতে পারলো না। কেমন যেন একটা অসহায়তা তার মুখে ছায়া ফেলল। তার ছাত্ররা, তার পাড়ারই সব ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা এখন অনেক বেশি স্মার্ট অনেক বেশি বোঝে—রিস্‌ক নেয়। মন্মথ ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। নিজেকে খুব অপমানিত মনে হতে লাগল। কে, কেন এবং কেমন করে তাকে অপমান করল ঠিক বুঝতে পারল না সে। কুঁকড়ে-যাওয়া' তাড়া খাওয়া একটা কুকুরের মতো মনে হতে লাগল।

পথে সেনদের বাড়ির পাশে একটি বউ তার কঙ্কালসার ছেলে কোলে করে বসেছিল। একজন বিধবা স্ত্রীলোক কি এক গাছের পাতাসমেত ডাল দিয়ে ছেলেটির আপাদমস্তক বুলিয়ে দিচ্ছিল এবং কি সব বিড়বিড় করে বলছিল। মন্মথ দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। ছেলেটির হাত পা ফুলে গেছে, চোখের পাতাতেও জল লেগেছে। অপুষ্টি আমাশার রিকেট তুকতাক করে কি ভালো হবে! মন্ত্রের শক্তি কতটা! মন্মথর মনে অনেক কথা এলো। পাশ দিয়ে একখানা অ্যাম্বুলেন্স বের হয়ে গেল হাসপাতালের দিকে। মন্মথ কিছুই বলল না। ক'জনকে বলবে। বুড়ি বলল, তোমার ছেলে সেরে যাবে, কত রোগ সারালাম (চ্যালেনজ গ্রহণ!)। পাশের ঝোপের থেকে একটা সজনে গাছের ডাল রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। তার নরম কচি পাতা সূর্যকে আড়াল করে রুগ্‌ণ ছেলেটিকে ছায়া দিচ্ছিল! (তিনজন মহাকাশচারীর জন্যে সারা বিশ্ব শোকাভিভূত!)

প্রচণ্ড শব্দ করে কয়েকটি বোমা ফাটল। বাজারের মোড়ে অনেকের সঙ্গে মন্মথও থমকে দাঁড়াল। কোথায় শব্দ হল? কোথায় কোনদিকে কেন! মন্মথ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। বুকের উপর বাঁ হাতখানা রেখে সে এগিয়ে চলল। যেন এই বিরাট শব্দপুঞ্জের উৎস তার বুক। তার অন্তস্তলে অনবরতই সশব্দে বোমা ফেটে চলেছে। বাইরে কাকে সে এ-কথা জানাবে! এরা কি তা বিশ্বাস করবে!

একটা রিক্‌শাওয়ালা বলল, এবারে মাস্টারমশাই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি!

কিরকম?

শোনেননি ? সর্দারদের সঙ্গে ওদের লড়াই লেগেছে—

ওদের মানে ?

রিকৃশাওয়ালা জয়নাল বলল, আহা মাস্টারমশাই যেন জানেন না কিছু। আপনারা শিক্ষিত লোক—

শিক্ষিত লোক ! কতদিন আমি শিক্ষকতা করছি ! ভাবল মন্মথ। কুসুম বলে, এতদিন চাকরি করে তোমার মোটে দু' হাজার টাকা জমেছে স্কুলে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হবে কি দিয়ে। মেয়ের বিয়ে দেব কি দিয়ে, কি রেখে যাচ্ছ ?

কি রেখে যাচ্ছ ! খচ্ খচ্ করে বুকের মধ্যে কাঁটা বেঁধার মতো করে বিঁধলেও মন্মথ সেটা হজম করেছিল। রসিকতা করে বলেছিল, এটাই ত ট্রাডিশন্ ! শিক্ষকের মেয়ে বিয়ে দিতে আবার টাকা লাগবে কেন ?

লাগবে না ? তুমি শিক্ষক হয়ে বাবার কাছ থেকে টাকা নাওনি ? বিয়ে কি অমনি হয়েছে।

শঙ্করের চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে স্থানীয় একজন কেরানী দু'জন মাস্টার একজন হাসপাতালের ডাক্তার একজন ফুটবল প্লেয়ার দুজন সুদৃশ্য যুবক একজন ফ্যামিলি প্লানিং-এর কর্মী বলাবলি করছিল মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাইরে পুলিসের সঙ্গে অ্যাবরিজিনালদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে। মন্মথ এখানে এসে অনেক সহজ বোধ করল। একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, আরে শিবেদা, করেছেন কি, গোটা ইলিশ একখান। বউদিকে ভাজতে বলুন, আসছি—। ইটভাটার মালিক শিবনাথ দাস হাসতে হাসতে বলল, আসুন না, আমরা কি ভয় পাই—। ডাক্তার বলল, গঙ্গার ইলিশ ত ওঠেই না ! ফ্যামিলি প্লানিং-এর কর্মী বলল, এখানে উঠবে কেন ? যান না বড়বাজারে, এই রিফ্যুজিদের বাজারে আবার ইলিশ ! আজই লোকটা পাঁচ সাতদিনের বরফ লাগানো কটা ইলিশ এনে বসেছে···। একজন যুবক বলল, ও-সব ইলিশের চেয়ে রুই মাছের চাকা অনেক বেটার। নটার ভোঁ বাজল। কলে জল পড়ছে। কোলকাতা থেকে গেঞ্জির থান নিয়ে একটা লরী এল। জয়বাঙলার পতাকা উড়িয়ে একখানা সুদৃশ্য গাড়ি বেরিয়ে গেল হাসপাতালের দিকে। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে যাচ্ছে বোধহয়। আবার কিন্তু কলেরা হচ্ছে, ডাক্তার বলল। স্থানীয় রিপোর্টার রিকশা থেকে নামল। সমস্বরে একই প্রশ্ন : কি সংবাদ ? সাংবাদিক শঙ্করকে চা দিতে বলে রুমালে

ঘাড় মুছল। সংবাদ ভালো নয়, কি গুমট দেখছেন। সর্দাররা প্রচণ্ড তীর চালাচ্ছে···প্রচণ্ড তীর চালাচ্ছে! মন্মথর ভগনের কথা মনে পড়ল। বছর দেড়েক আগে ভগন সর্দার বউ সঙ্গে করে তাদের বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল। লম্বা চওড়া জোয়ান। কিন্তু পেটটা পিঠের সঙ্গে লেগে ছিল। ওকে ত মোটেই দুর্ধর্ষ মনে হয়নি। হিংস্রও নয়। ভগন ধুঁকছিল! ক্ষুধায় ধুঁকছিল।

বাজার তখন ভাঙার পথে। দোকানপাট দ্রুত বন্ধ হচ্ছিল। মিলিটারী গাড়ি যাতায়াত করছে (মুক্তিফৌজের অগ্রগতি!)। গ্রাম থেকে আসা তরকারিওয়ালারা কেবল বসে আছে। মন্মথ কিন্তু বেশি পরিমাণেই তরি-তরকারী কিনল, বলা যায় না আবার কার্ফু-টার্ফু হয়ে যেতে পারে। পয়সা দিতে দিতে বলল, কিহে, তোমরা যে সব বসে আছো? বাড়ি যাবে না? একজন বলল, আমাদের বাবু বাড়ি গেলে চলে? তরিতরকারী বেচব, চাল কিনব—তারপর যাব। একজন পুঁইশাক, ডাঁটার শাক নিয়ে বসেছিল, সে বলল, এইসব বাজারে হুজ্জোত আমরা গ্রাহ্যই করিনে—। আপনারা বাড়ি চলে যান, আমরা বাজার চালু রাখব—

মন্মথ আর দেরি করল না। দ্রুত বাড়ি চলে এলো।

কুসুম আজ কিন্তু রাগারাগি করল না তার দেরি হয়েছে বলে। সে বরং কিছুটা ভীত, সন্ত্রস্ত। ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ করে দিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের ঘরের মেঝেয় বসিয়ে দিয়েছে। বলল, এত দেরি করছিলে কেন, চারদিকে বোমা ফাটছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি আসতে হয়ত···

মন্মথ পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে বলল, চারদিকে হবে কেন, একই দিকে। আমাদের ভয় কি। ভদ্রপল্লীর কিছু হবে না—

উদ্বাস্তু কলোনি আবার ভদ্রপল্লী। এখানে তো গোলমাল লেগেই আছে। তখন বলেছিলাম কোলকাতার চাকরি ছেড়ে এসো না, স্টেট ট্রান্সপোর্টের চাকরি ছেড়ে কেউ মাস্টারিতে আসে! কুসুম তরকারী কুটতে কুটতে আরও কি সব বলতে লাগল। মন্মথ চুপচাপ মনাকে কোলে করে বসে থাকল। কুসুমের কথার মধ্যে সত্য ছিল, সুতরাং প্রতিবাদ করার কিছু নেই। তবে আজকের তার কথার মধ্যে ঝাঁঝের মাত্রা তেমন নেই, বরং একটু পরে কুসুম এক পেয়ালা চা এনে মন্মথর সামনে রাখলে সে যথার্থ খুশি বোধ করতে লাগল।

চিনি পেলে কোথায়?

কুসুম বলল, দোকানের ওখানে না-কি পুলিশের লোকেরা তোমাকে কি সব জিজ্ঞেস করছিল—

ও এমন কিছু নয়। সঙ্কোচ ও অপমানবোধ তার মনে ছায়া ফেলল। কে তাকে অপমান করল! এখনও ঠিক পরিষ্কার নয়।

কুসুম বলল, কেন থাকো ও সবের মধ্যে, পুলিশ দেখলে পালিয়ে আসতে পার না?

পালাব! কেন? আমি একজন শিক্ষক—

শিক্ষক! ভারি ত শিক্ষক। আজ মাইনে দেবে তো?

দেখা যাক, দেবে নিশ্চয়ই কিছু—পার্ট পেমেণ্ট হতে পারে—

পার্ট পেমেণ্ট কেন? আধ-পেটা খেয়ে কি মাস্টারমশায়ের দিন যাবে?

এত কথা বার বার ভালো লাগে না! মন্মথ বলল, দেখ অন্যান্য কর্মচারীর সঙ্গে শিক্ষকদের একটা পার্থক্য আছে। শিক্ষকতা করব অথচ প্রতিমাসের পয়লাতে পুরো বেতন আনব, তা হয় না। মাস্টারদের কাছে জাতিগড়ার আদর্শই বড় কথা, মাইনে বড় কথা নয়—এটা তুমি ত জান—

জানি না আবার! ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? কতদিন ওদের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ দুধ কেনা হয় না। সোনা একটু দুধের জন্যে কেমন করে। ওষুধও ত কতদিন আসে না—

মন্মথ সোনা মনার দিকে তাকালো। রোগা-নির্জীব, কুসুমের দিকে তাকালো—নির্জীব।

তোমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ওই ত ক'টা টাকা, ঐ দিয়ে ওদের মানুষ করতে পারব, সোনার বিয়ে দিতে পারব?

মন্মথ নিজের দিকে তাকাল। চোখের অসুখ চলছে, ডাক্তার দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। খেতে দিতে পারবে না বলেই গত বছর তিন মাসের ভ্রূণ-কিউরেট করে এসেছে। তবুও দু'টি ত আছে, মন্মথ মরে গেলে ওদের মানুষ করা—সোনার বিয়ে দেওয়া।

ভবিষ্যতের কথা আর ভাবতে পারছি কই? যা দিনকাল পড়েছে—

দিনকাল ত দেখছি তোমারই খারাপ। সকলেই ত বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে—ভালো কথা, তোমার শশাঙ্কমামা এসেছিলেন—

না-কি? তার আলু-পেঁয়াজের ব্যবসা চলছে কেমন?

মনে হয় ভালোই চলছে, মেয়ের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন করে গেলেন। এবার

কিন্তু ভালো একটা জিনিস দিতেই হবে, ছেলের মুখেভাতে ত পালিয়ে বেড়ালে—

উপায় কি, এত অন্নপ্রাশন হলে—

আহা, এত আবার কোথায়, চারটে ছেলেমেয়ে কি খুব বেশি হল—

বেশি বইকি। শশাঙ্কমামা লাল ত্রিকোণ মানেননি—

সবাই কি তোমার মতো—

কুসুম গম্ভীরভাবে কাজ করছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে মন্মথ বলল, ব্যক্তিগত সুখের জন্যও ফ্যামিলি প্ল্যানিং দরকার—

সুখ ত ধরছে না, একটা স্টীলের আলমারী কিনেছ, তার জন্যেও তাগাদার চিঠি আসে—

চিঠি আসে মানে, এসেছে?

গত মাসের ইন্‌স্টলমেণ্ট দাওনি, মনে আছে?

ব্যাটারা আচ্ছা খচ্চর তো! একটা ইন্‌স্টলমেণ্ট দিতে পারিনি, অমনি চিঠি! ভেবেছিলাম, ওদের কাছ থেকে ইন্‌স্টলমেণ্টে প্রেসার কুকার কিনব। অন্য কোম্পানি দেখতে হবে। এ মাসের মধ্যেই ওদের টাকাটা শোধ দিয়ে দেব। এবারে চারমাসের ডি. এ. আসছে পে কমিশনের দরুন এরিয়ারও কিছু পাব, ঠিক মিটিয়ে দেব (চ্যালেনজ গ্রহণ!), দেখি চিঠিখানা—

রেডিওর পর আছে, দেখ গে। শশাঙ্কমামার মেয়ের জন্যে একটা স্টীলের থালা বা ভালো বাটি এনো কিন্তু, ভুলে যেও না—

সদর দরজায় তালা লাগানোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্কুলে গেল মন্মথ। কুসুমের অবশ্য উপায় নেই। রাস্তার ট্যাপ থেকে জল তাকে আনতেই হয়। বাড়ির টিউবওয়েলের জলে কাপড় কাচা সম্ভব নয়, লাল হয়ে যায়, স্নানও করা যায় না। এবারে খাতা দেখার টাকা পেলে কুসুম জলের পাইপ বাড়িতে আনবেই। মন্মথকে সে বলেই রেখেছে, না হলে জল টেনে টেনে সংসার করা সম্ভব নয়। শরীরে সয় না অত ধকল, তাছাড়া লোকেই বা কি বলে!

ছাত্রদের মধ্যে একটা উত্তেজনা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। স্কুল অবশ্য শুরু হল। মন্মথ ইংরেজি গদ্যের একটা প্রশ্ন নিয়ে ক্লাশে আলোচনা করছিল। উপস্থিতির সংখ্যা কম। কিছু কিছু ছাত্র বাইরে রয়েছে তখনও। দু'জন হন্তদন্ত হয়ে ক্লাশে ঢুকল। দু'জন বের হয়ে গেল। ক্লাশে চাপা

উত্তেজনা। দোতলার জানলা দিয়ে কেউ কেউ বাইরে তাকাচ্ছে। দূরে মাঠের দিকে একটা জটলা। মাঠের মধ্যে সি. আর, পি.র ক্যাম্প হয়েছে। আণ্ডারওয়ার পরে কয়েকজন স্নান করছে। মন্মথর কথা বিশেষ কেউ শুনছে না। দু' একজন ভালোছেলেগোছের ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাচ্ছে। কি হচ্ছে ওরা টের পাচ্ছে না বোধহয়। মন্মথ চেঁচানোর মাত্রা বাড়িয়ে দিল। লাফ দিয়ে বোর্ডে গিয়ে দু'চারটে পয়েণ্ট লিখে বলল, টুকে নাও—

স্যার, এবার ফাইনালে না-কি খুব নকল হয়েছে, বই খুলে সব লিখেছে—

জানি না, এগুলি টুকে নাও—

স্যার, হাফ-ইয়ার্লি হবে ত ?

তোমরা দিলে হবে—

স্যার জল খেতে যাব—

ছেলেটিকে মন্মথ চেনে না তেমন। বলল, কি নাম তোমার, বাড়ি কোন পাড়া ?

ছেলেটি নাম বলল।

স্যার, বাড়ির কথা আজকাল বলা ঠিক নয়—কার মনে কি আছে !

মন্মথ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকল। রেগে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে ফেলেছে। সত্যি কথা বলতে কি ছেলেটি কোন পাড়ায় থাকে তা জানার খুব আগ্রহ নেই—

এমন সময় পর পর দুটো পটকা ফাটার আওয়াজ হল। ছেলেরা হইচই করতে করতে বের হয়ে গেল। ফাঁকা ঘরে মন্মথ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। জানলা দিয়ে বাইরে মাঠ দেখা যায়, ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করছে। পায়ে এখন ওদের অনেক শক্তি, মনে ক্লাশ না-করার মুক্তি ! আমরা কি ওদের আবদ্ধ করে রাখি, ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়াই ! ভাবল মন্মথ। একদিন একটা ছেলেকে বলেছিল, লেখাপড়া না করলে যে বিপদে পড়বে বাবা, তোমাদের ত চাকুরে পরিবার, কি করবে জীবনে—

ছেলেটি বলেছিল, লেখাপড়া করলে চাকরি হবে, গ্যারাণ্টি দিতে পারেন স্যার ? পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছেলে ভাইস্ চ্যান্সেলারের নাকের উপর সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলে দেয় কেন ?

মন্মথ ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। একটি ছেলে বলল, স্যার যতদিন পর্যন্ত আমাদের স্কুলের ছাত্রকে না ছাড়ে আমরা স্ট্রাইক করে যাব।

টিচার্স-রুমে এসে খবরের কাগজটা টেনে নিল মন্মথ। মুখখানা আড়াল করাই বোধহয় তার ইচ্ছা, কাগজে না-পড়া সংবাদ ত কিছু নেই—

তারাপদবাবু বললেন, মন্মথ কাগজের শিটটা একটু দেখতাম।

স্কুল পোড়ার পর থেকে একখানা করে কাগজ নেওয়া হয়, ফলে কাগজ নিয়ে টানাটানি। মন্মথ নিঃশব্দে শিটটা এগিয়ে দিল।

এখানে এখন হই হল্লা। পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যৎ নিয়ে উচ্চকণ্ঠ আলোচনা, এ, বি, টি, এ. কো অর্ডিনেশন, বোর্ড-গ্রাণ্ট। শিক্ষক বনাম রাজনীতি, খুনোখুনি, অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ, মহাকাশচারীদের জন্যে কাতরোক্তি—

দুই টেবিল এক করে চুপচাপ পড়ে ছিল মন্মথ। সুভাষ বলল, কি হে, পে-ডেতেও চাঙা হতে পারছ না। মন্মথ সাড়া দিল না। তামাক বের করে সুভাষ সিগারেট পাকাতে লাগল, হঠাৎ বলল, মনে হয় যুদ্ধটা বাধলই।

যুদ্ধ? কোথায় যুদ্ধ—

ফস্ করে দেশলাই জ্বেলে সুভাষ বলল, ভেতরে। বুশ শার্টের বোতাম খুলে পাখা করতে লাগল সুভাষ, মিনতির বাবা ওর বিয়ে ঠিক করেছে—

বৃষ্টি পড়ছে। গুমট গরম কি এবার কাটবে—

সুভাষ বলল, কি হে, ঝিম মেরে বসে আছো যে! নাঃ, তোমরা বিয়ে-করা লোকগুলো নিতান্তই বস্তাপচা হয়ে গেছ।

মন্মথ বিকাশের দিকে তাকালো। বিকাশ চোখের উপর হাত রেখে চুপচাপ শুয়ে আছে। কেউ এখন বিকাশকে বিরক্ত করবে না। ওর একটা বোন সম্প্রতি পাড়ার এক মস্তানের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

শীতল বলল, কাজটা আপনার ঠিক হয়নি মনোরঞ্জনদা—

মনোরঞ্জনদা একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, ভালো মন্দ অত চিন্তা করিনি। ওরা চাইছে, ওদের বাড়িতে আমিই ট্যুইশানি করি—

শীতল এম এ পরীক্ষার সময় তার ট্যুইশানিটি মনোরঞ্জনবাবুকে দিয়ে গিয়েছিল। এখন মনোরঞ্জনবাবু ওটা ছাড়ছেন না বলে শীতলের আপত্তি। এই রকম একটা সময়ে যখন স্কুলে সম্পূর্ণ বেতন মিলছে না, যখন স্কুলে পরীক্ষাদি হচ্ছে না বলে ছেলেরা প্রাইভেট পড়তেও আসে না, তখন একটা ভালো ট্যুইশানি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় শীতল রেগে আছে। আসল কারণ একটু পরেই মনোরঞ্জনবাবু প্রকাশ করলেন, ওদের বাড়িতে বড় সব মেয়েরা রয়েছে আর তুমি একজন যুবক—

শীতল বলল, সেক্ষেত্রেও আপনিই ভয়ের কারণ, আমি নই—

কী, এত বড় কথা—

সুভাষ এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়াল।

তখন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। বাইরে লতা-পাতা ফুলের গাছের উপর অজস্র বর্ষণ। আঃ পৃথিবী ঠাণ্ডা হচ্ছে!

অফিসের মধ্যে থেকে জীবনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, পঞ্চাশ টাকায় আমার কিছুই হবে না। যেহেতু আজই অনেকের পাওনা মেটাতে হবে—। একি সামান্য পঞ্চাশ টাকা! জীবনবাবু অনেক কথা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

বাজার থেকে ফিরছিল মন্মথ। একটা স্টীলের বাটি সে কিনেছে শশাঙ্ক-মামার মেয়ের জন্যে। পথে সুভাষ, জীবনবাবু, শীতল, মনোরঞ্জনদার সঙ্গে দেখা —সকলেই হাসিখুশি, হেসে হেসে রাস্তায় লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে। সুন্দর ফরসা কাপড় জামা পরেছে, জুতো পায়ে দিয়েছে, কেউ বউ সঙ্গে করে যাচ্ছে, কেউ বা ছেলেমেয়ের হাত ধরে। সুভাষ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কি হে, মন্মথ, কি কিনলে ওটা? পাশে দাঁড়িয়ে তার বন্ধু পান চিবচ্ছে। শীতলের টেরিলিনের ফাঁকে সুন্দর গেঞ্জিটা ঝকঝক করছে। শীতল গেঞ্জি-বিশেষজ্ঞ। ভালো দামী গেঞ্জি কেনা যে বিশেষ লাভজনক এ-কথা সে প্রায়ই বলে থাকে. মনোরঞ্জনদা বললেন, এবার যখন কোলকাতা যাবে, তোমার বউদির জন্যে এককৌটা ভালো জর্দা এনে দিও শীতল। জীবনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, পুজো তো এসে গেল, ধীরে ধীরে জামাকাপড় কিনতে হয়। শীতল বলল, সুভাষ সিনেমায় যাবে?

আশে পাশে কেরানী, শিক্ষক, ডাক্তার, ফুটবল প্লেয়ার, ফ্যামিলি প্লানিং-এর কর্মী, সাহিত্যিক প্রমুখ সামাজিকগণ জটলা করছিল। একটু পরেই তাসের আসর বসবে, রাত্তি আটটা ন'টা পর্যন্ত তাস খেলা চলবে।

একখানা পুলিশের গাড়ি হঠাৎ আবির্ভূত হল এবং ঘোষণা করলঃ আজ সন্ধ্যা সাতটা থেকে আগামীকাল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কার্ফু বলবৎ করা হইল।

শহরে পাড়ায়-পাড়ায় অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ চলছে··

মন্মথ দেখল মুহূর্তে তার সামনে থেকে সব উধাও হয়ে গেল। ফাঁকা শূন্য হয়ে গেল। সোনা মনা আর কুসুমের জন্যে সে পাঁউরুটি কলা বিস্কুট কিনে ঘরে ফিরল॥

রক্তিম বসন্ত

সাধন চট্টোপাধ্যায়

শহরে বসন্ত এসেছে। উগ্র। মধ্যাহ্নে রাজপথের পিচ গলে ওঠে। তপ্ত ভাপ আর টায়ারের আঁকা-বাঁকা বরফি দাগ। টকটকে রক্তের মত পানের পিচের ছড়া। রুক্ষ ধুলো আর শালপাতার কান ছেঁচড়ানি।

আকাশটা ঘোর নীল। ভয়ানক উজ্জ্বল। যেন শান দেওয়া কোন ধাতুর তরোয়ালের ঝিকিমিকি। শূন্যে কালো বিন্দু বিন্দু এক ঝাঁক শকুন। গলিত শবের আশায় ঘূর্ণমান। গনগনে আঁচের মত শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া। পাতা আসে নি। নেড়া গাছে রক্তের বাহার।

শহরটা থমথমে। গুলি, বারুদ, গুপ্তহত্যা—প্রতিটি অধিবাসীর চোখে মুখে মৃত্যু-দূতের কালছায়ায় আশংকা। মন খুলে কথাবার্তা নেই, কেমন চাপা ফিসফিসানি।

তবুও এরই মাঝে দু' এক ঝলক মৌ-তাত হাওয়া হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। মনটা ছটফট করে ওঠে।

জংশন স্টেশনের থামের পাশে ভিখিরি মেয়ে সোনা চুপচাপ বসেছিল। দূরে ইটে ঘেরা রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া। মালগাড়ি শান্টিং-এর আওয়াজ। পুরনো ইঞ্জিনের গর্ভে জল ঝরে। পুরনো পাথরের নুড়ি, ঝকঝকে ইস্পাতের রেল। সোনা কাঁকরবালি বয়ে আনা গরম বাতাসে চোখ জোড়া কুঁচকে থাকে। সারাদিনের ধোঁয়া, ধস্ এবং কালির মধ্যেও উগ্র বসন্তের ছোঁয়াচ মনটাকে কেমন নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

চোখ ঠেরে ঠেরে পাশের ভিখিরি গায়কটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ওঠে। জীবনে প্রথম প্রেমের হাসির মত।

'অমূল্য! ও অমূল্য!'

গায়কটিও আজ আনমনা। লাউয়ের খোলের একতারা হাতে থমথমে শহরটার দিকে তাকিয়ে আছে। আজ বসন্তোৎসব—দোল! বোধ হয় শহরের পথ অমূল্যকে টানছে।

'বল !'—আচমকা হুঁশ ভাঙে অমূল্যর।

'মরণ! কি বলব আমি ?'—

'ডাকছিস যে ?

সোনার ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'হুঃ, ডাক আর এল কই ?' একটা গাড়ি বেরিয়ে যেতেই উদাস গলায় বলে, 'ভবের গাড়ির ডাক আর পেলাম কই ?'

অমূল্য দাঁত বার করে। পানের রঙে রাঙান।

'ভবের গাড়ি কেনরে, মনের মানষের ডাক পাস না ?'

'ধুর মুখপোড়া! · কি দেখছিসরে হাঁ করে ?

'দোল! ··শহরে আজ কেমনই না চলছে !'

'পোড়ার ইস্টিশান।···কিছু বোঝার উপায় আছে !'—সোনা মুখ বেঁকায়।

অমূল্য গম্ভীর হয়ে বলে, 'গরমেণ্টের জায়গা! ·এখানে কি রঙ খেলা চলে ? দেখবি কি করে ?'

সোনা চুপ।

'শহর ঘুরলে দেখা যায়।···যাবি ?'

খানিকটা ভেবেচিন্তে দু' জনে শহরের পথে নেমে পড়ে। এসব দোল খেলার নিষিদ্ধ এলাকা। কতদিন আগে থেকেই ত ওরা নোটিশ টাঙাচ্ছে 'সরকারী সম্পত্তি আনন্দোৎসবে কালিমালিপ্ত করবেন না'। তাই ওরা স্টেশনের আশ্রয়স্থল ছেড়ে ঘণ্টা তিনচারের জন্য শহরের পথে নেমে পড়ল। শাণিত আকাশের নিচে ষষ্ঠঋতুর মৌতাত হাওয়া তখন মেতে উঠেছে।

স্টেশনের এই দুই আশ্রিত চলে গেলেও, এলাকাটার ব্যস্ততা এতটুকু কমেনি। এখানে মানুষ কর্মচঞ্চল। দূরপাল্লার যাত্রী, হকার ভেণ্ডার এবং অসংখ্য অলস ভবঘুরেদের দৌলতে ব্যতিব্যস্ত। শুধু প্লাটফর্মের গাছগুলো বছর বছর চেহারা পালটায়। আর দেয়ালের রঙ। এ ছাড়া সব কিছুই নিত্য প্রায় একরকম।

আজও তাই দুপুরের দূরপাল্লায় ট্রেনটাকে বিদায় দেবার জন্য বাবুমহল থেকে সুইপারটা পর্যন্ত ব্যস্ত। কোন ফুরসত নেই। গাড়ি ধোঁয়া-পোছা, ব্রেক দেখা, লাইট ফ্যান লাগান—সময় ব্যস্ততার সঙ্গে বয়ে যায়।

ঠিক সেই সময়টাতেই সঙিনধারী পুলিশ তিনজনকে প্ল্যাটফর্মে হাজির করল। তিন বন্দী। দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অপরাধে ধরা হয়েছে। একজন ঝালাই শ্রমিক, একজন খেতমজুর, অপরজন ছাত্র। এই দূরপাল্লার

ট্রেনে সুদূর মফস্বলের একটি শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে এদের বিচার অর্থাৎ গোপন হত্যা।

স্টেশনের মানুষগুলোর দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে তিন বন্দী পা টিপে টিপে প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি একটি থামের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। পুলিশই আদেশ করেছে। সুতরাং গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। তাই ধুলোর পরই তিনজন বসে পড়ল। আঃ! কেমন যেন আরামের নিশ্বাস! মেরুদণ্ডটায় ব্যথার একটা ঝিলিক খেয়ে গেল।

পুলিশকে হুঁশিয়ার করে অফিসাররা একটু দূরে, চা সিগারেট খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করতে থাকে। বন্দী তিনজনের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কৌতূহলী মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। বাইরের জীবনে একটু ব্যতিক্রম দেখলেই কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাই, এ তিনজনকে ঘিরে একটা ছোটখাটো জটলা তৈরি হয়ে গেল। কি ব্যাপার! কারা! কি জন্য! প্রতিটি মানুষের চোখে মুখে জিজ্ঞাসা। বন্দী তিনটি নির্বাক। রুক্ষ চুল, চোয়াড়ে, বলিষ্ঠ চেহারা। চোখ অবসাদক্লিষ্ট। মুখের এখানে ওখানে কালশিরা দাগ। এমন কি নখের মাথাগুলো রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত। সুঁচ ফুটোনোর চিহ্ন।

ইতিমধ্যে ভিড়ের মধ্যে ফিস্‌ ফিস্‌ শুরু হয়ে গেছে। চাপা টুকরো টুকরো নানান মন্তব্য।

'...বিচার হবে।'

'না!...জেল হয়েছে।'

'উহুঁ,.. বোধ হয় খুন করবে'—কে যেন হিসিয়ে উঠল। সবাই আলোচনা থামিয়ে বক্তার চোখের দিকে তাকিয়ে পড়ে।

'হতে পারে!...ও'ত আজকাল মামুলি জলভাত',—একজন ব্যাজার মুখে বলে উঠল। দু' একজন শিউরে ওঠে। ভয়ে ভয়ে তিন বন্দীর মুখের দিকে তাকায়।

পুলিশ কিন্তু বেশিক্ষণ ভিড় জমাতে দেয় না। আড়চোখে তাকাতে তাকাতে এক লাফে উঠে এসে বলে, 'কাজে চলে যান না, এখানে কেন?'

যাই যাই করেও মানুষ যায় না। নতুন নতুন মানুষ এসে জড় হয়।

বন্দীরা সব কিছু দেখছিল। মানুষজন, গাড়ি, স্টেশন, কালিমাখা শেড্‌, এমনকি ফাঁক দিয়ে একটুকরো নীল আকাশও উঁকি দেয় ওদের চোখে।

হঠাৎ একটি অফিসার গটগট করে এসে কড়া মেজাজে চেঁচিয়ে উঠল, 'থার্ড ম্যান কোথায়?…দু'জন দেখছি যে?' পুলিশরা সন্ত্রস্ত। শ্রমিকটি ক্লান্ত হয়েছিল বেশি। একটু পাশেই গড়িয়েছিল, সে হঠাৎ নজরে আসে না। অফিসারটি কাছে আসতেই ঘাড় ঘুরিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'এই যে শালা, আমি এখানে।' অফিসারটি রাগে কাঁপতে থাকে। মুখের পেশী শক্ত। হঠাৎ শান্ত গলায় বলে 'বিচারের আসামী…সম্মানী ব্যক্তি।…কথাবার্তাগুলো একটু ভদ্রভাবে বলতে হয় না!' শ্রমিক নির্বিকার। ঘাড়টা বাঁকান অবস্থাতেই বলে উঠল 'আমাকে খুন করার মহান দায়িত্ব আপনার আছে…নির্বিঘ্নে তা করতে পারেন…কিন্তু উপদেশ দেবার অধিকার নিশ্চয় নেই।' অফিসারটি নিরুত্তরে গট্‌গট্‌ করে এগিয়ে যায়। মানুষগুলো থ।

ইতিমধ্যে পুলিশ আর একবার ভিড় সরিয়ে দেবার জন্য তাড়া দিয়ে গেল। পুরনো লোক যায়, নতুন লোক আসে।

হঠাৎ কৃষকের ছেলেটি বলে উঠল, 'আমাদের গাড়ি ক'টায়?' ভিড় থেকে জবাব এল, 'আধ ঘণ্টা পর।'

'—শহরে ক'টায় পৌছব?'

কেউ জবাব দিল না। ছাত্রটি গম্ভীর হয়ে বলল, 'সে সুযোগ হয়ত আর দেবে না।'

ভিড়ে অনেক মুখ খোলে না। চাপা ভয়। কি জানি, কখন কোন ষড়যন্ত্র ঘাড় মটকায়। মনে মনে ভাবে 'শালা, আজকাল আর জীবনের মূল্য নেই।'

ধুলো বালি নিয়ে বাতাস ঝাপটা দেয়। কৃষ্ণচূড়া দোলে। ট্রেন প্রায় প্রস্তুত। হাতে মিনিট কুড়ির মত সময়।

ঝালাই মজুর হঠাৎ ছাত্রটিকে বলল, 'মরতে আমার একটুকু দুঃখ নেই।' চোখ জোড়া তার অস্বাভাবিক চকচক করে, 'বুড়ো মা'র কথা ভাবি।…কাল ধরা পড়বার সময় খবরও পায়নি।…কি জানি হয়ত ভাবছে, দোল-টোল খেলে বাড়ি যাব।'

ছাত্রটি মৃদু হাসে। ওর মনে পড়ে, বছর তিনেক আগে এই প্ল্যাটফর্মেই একদিন দারুণ উত্তেজক ঘটনা ঘটেছিল।

সকালের দিকে কলেজে রটে গেল এক ছাত্রকে পুলিশ রেলওয়ে স্টেশনে গ্রেপ্তার

করেছে! আটকে রেখেছে স্টেশন মাস্টারের ঘরে। কথাটা যেন ফুলকি ছড়িয়ে দিল। বাঁধভাঙা জলের মতো হুড় হুড় করে ছুটে এল সব। পড়ে রইল ক্লাশ, পড়াশুনো। স্টেশন-গেটের বাইরে তখন হাজার হাজার ছেলে। ছাত্রটির মুক্তির দাবি করতে করতে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। মানুষের চাপে সেদিন তিলধারণের জায়গা ছিল না। ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজক খবর রটছিল সব। হঠাৎ লাঠি চার্জ। সপাসপ এলোপাথারি মারতে মারতে পুলিশ এগিয়ে আসছে। ঠাসা ভিড়ে লেগেছে দোলা। ছুট, ছুট, ছুট—যে যেদিকে পারে। চিৎকারে সন্ত্রাসে স্টেশনে বাতাস মথিত। ছাত্রটি ভয়ে ছুটতে ছুটতে সেদিন এই থামের গোড়ায় এসে লুকিয়েছিল। ঢেঁকির পাড় পড়ছিল বুকে। মাথার ওপর ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ঘামছিল সেদিন। মস্ত কালো ঘড়িটা—লাফিয়ে লাফিয়ে মিনিটের কাঁটা পার হয়।

ঘড়িটা আজও সে রকম আছে। ভাবতে ভাবতে ছাত্রটি বলে উঠল, 'বাব্বা।' কৃষকের ছেলেটি বলল, 'কি ?'

'নাঃ—অমনি।'

ঝালাই শ্রমিকটির চোখজোড়াও আপনমনে ঝলসে ওঠে। চোখের সামনে ভাসে প্রিক্ প্রিক্ নীলচে আলো। আলট্রা ভায়োলেট রে। মেশিনের ঘরঘর। ক্লেদ। ধূলিমলিন জীবন। বাঁচবার আশা। প্রেম। হাসিঠাট্টা। লড়াই।

বস্তির কথা মনে পড়ে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটনির পর, চুলে গোঁফে পাটের আঁশ মেখে বাবা ফিরত। টলতে টলতে ঢুকেই কোঁচড় খুলে মা'কে শান্ত গলায় বলত, 'বউ···যা, একটু মদ আন।' মা'র কি অসহায় করুণ দৃষ্টি। দিনে দিনে ক্ষয়ে যাওয়া বাবার শরীরটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন গলায় বলত,···'ও না খেয়ে আমার বুকের রক্ত গেল।' তারপর বস্তিতে কত নতুন লোক এল গেল। সংগঠন, রাজনীতি, আন্দোলন। বস্তি আস্তে আস্তে মেতে উঠতে লাগল। পুলিশ হানা দেয়। ছাঁটাই লে-অফ চলে। বাবার কোন পরিবর্তন নেই। কেবল মদ গিলে বুঁদ হয়ে বলত, 'বাঁচা-মরা নিজের হাতে নেই · কেবল পরিশ্রম কর · মানুষ আর শুয়োর এক।'

মা শুনতে শুনতে ধমকাত, 'কি যে বক্‌বক্ করছ।'

ঘোলা চোখজোড়া উঁচিয়ে জবাব দিত, 'মানুষ আর শুয়োর···সব এক।'

একদিন শীতের রাতে কারখানা থেকে ফেরার পথে বাবা রাস্তায় মরে

গেল। ঠিক একটা ঝোড়ো পাখির মত। ছেলে তখন রাজনীতি ও সংগঠন নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।···

ইতিমধ্যে পুলিশ আর একবার ভিড় সরিয়ে দেবার জন্য তাড়া দিয়ে গেল।

কৃষক ছেলেটি একটু কৌতূহলের চোখেই মানুষজনকে দেখছিল। বহুবছর আগে, ছোটবেলা মায়ের সঙ্গে গ্রাম থেকে সে একবার এ স্টেশনে এসেছিল। বাবা এবং ঠাকুমা, দুজনে মিলে মাকে পিটিয়েছিল খুব। শীতের বিকেল। মাঠের ফসল কর্তাদের গোলায় তুলে নিজেদের প্রাপ্যটুকুও কর্জশোধে ব্যয় করে বাবার মেজাজটা ছিল ভয়ানক খারাপ। কি এক সামান্য অপরাধেই ঠাকুমার সাথে মা'র তুমুল ঝগড়া হয়। বাবা, ঠাকুমার পক্ষ নিয়ে মা'কে চ্যালা কাঠ দিয়ে মারে। দুঃখে অপমানে সে-সন্ধ্যায় মা ছেলেকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে। যাবে বাপের বাড়ি। আর এমুখো হবে না। এই স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হয়। মা'ও ঠিক পথঘাট চিনত না। দু'দিন, দু'রাত্তির এ প্ল্যাটফর্মে পড়ে থেকে আবার ফিরে গেছল গ্রামে। সে অনেক দিনের কথা।···

ছাত্রটি নাক চোখ কুঁচকে শরীরে একটা ব্যথা অনুভব করল। শেষে একটু উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'নাঃ, কিছু গান শুনিয়ে দেই।··আর'ত শোনাবার সুযোগ পাব না।' ঝালাই শ্রমিকটি বলল, 'কষ্ট হবে না?' ছাত্রটি জবাব দিল না। মনে মনে কি ভাবতে লাগল।

'সূর্যোদয়ের সময় হল শুরু,
নগ্ন থাবা, অন্ধকারের বুক যে দুরু দুরু।'

মানুষজন হাঁ হয়ে যায়। গান শুনতে শুনতে কখন যে বেলা বাড়ে বুঝতেই পারে না। এমনকি ভেণ্ডার, চায়ের দোকানের ছোকরা, ঝাড়ুদার ভিড়ে গলা বাড়িয়ে কান পেতে থাকে। একটার পর একটা গান হয়।

'···স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া সুকঠিন, শক্ত
প্রয়োজনে দিতে পারি একবুক রক্ত'

ভিড়ের মানুষের চোখমুখগুলো চকচক করে ওঠে। বুক থেকে ওঠে মাঝে মাঝে গভীর নিশ্বাস। গরম। হৃদয়টা কেমন নড়ে চড়ে ওঠে। দু'চারজন ছাপোষা মানুষ ভয়ে সটকে পড়ে। ভিড় দেখলেই ভয় হয় ওদের। কি জানি, যদি কোন গণ্ডগোল বাধে।

'তোমাদের হাতে আছে মৃত্যু,
আমাদের সঙ্গী যে প্রাণ
পতনের মুখোমুখি তোমরা, সম্মুখে
আমাদের উত্থান।

একটি ছেলে আর থাকতে পারল না। সে হকারি করে ট্রেনে। ভিড় ঠেলে কাছে এসে ছাত্রটিকে বলল, 'আপনাদেব কি কোন কিছু দরকার আছে?'

ছাত্রটি হেসে :বলল, 'না।' সে খুব ঘেমে উঠেছে। গান গেয়ে গেয়ে শুকিয়ে গেছে গলা। একটু ভেবে বলল, 'জলের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।' হকারটি বেরিয়ে যায়। একটু বাদেই, ছুটে জল নিয়ে আসতেই, একজন অফিসার গটগট করে এগিয়ে এসে বলল, 'ফেলে দিন। এ ধরনের কিছু চেষ্টা করবেন না।' ছাত্রটির চোখজোড়া ধক্ করে ওঠে। মৃদু হেসে তাকিয়ে থাকে ফেলে দেওয়া জলের ভাঁড়টার দিকে।

লোকের ভিড় কিন্তু কমে না। শ্রমিকটি এবার শান্তগলায় বলল, 'আমরা'ত খুন হবই···আপনাদের ওপরও শালারা ঝামেলা করতে পারে···মিছে কেন হাত পা ভাঙবেন, চলে যান।'

কৃষক ছেলেটি মুখ তোলে। খুব খিদে পেয়েছে ওর। এমনিতেই ও একটু বেশি খায়, তারপর সকাল থেকে অভুক্ত। গতরাতের অত্যাচারে শরীরটা ঠিক রাখতে পারছিল না।

'আমার ঘুম পাচ্ছে '

'গাড়ি লেগেছে···এবার তুলবে আমাদের···ওখানে ঘুমোস'—ছাত্রটি জবাব দেয়।

'যদি না দেয়···উঃ, তলপেটটা ব্যথা করছে।'

শ্রমিকটি বিষণ্ণ চোখে চুপ করে থাকে।

স্টেশনে ব্যস্ততা। গাড়ি দিয়েছে। এবার ছাড়বার পালা। অফিসাররা শেষবারের মতো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাগুলো সেরে নেয়।

আবার এক ভাঁড় জল। কার যেন হাতটা এগিয়ে এল।

'নিন···নিন···চটপট খেয়ে নিন।'

'দেখছে···দেখছে'—কে একজন সাবধান করবার আগেই এক ঝটকায় জলের ভাঁড়টা ছিটকে পড়ল।

সমস্ত মানুষ উদগ্রীব। অফিসারটি ছাত্রটির সামনে এসে বলল, 'গান

থামাতে হবে।' ছেলেটি হাসছে, মৃদু মৃদু, 'গলায় বেড়ি পরবার আগে নয়।'

'মানে ?—ঝাঁঝিয়ে উঠল পুলিশ অফিসার।

গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'টিপে ধরুন, থেমে যাবে।'

'সাহস হয় একথা বলতে ?'

'মৃত্যুযাত্রীরা'ত সাহসের জোগান দেয় পৃথিবীতে···ইতিহাস পড়েন নি ?

ঠিক এ সময়েই কে যেন ভিড় থেকে একটা শূন্য ভাঁড় ছুঁড়ে মারল। ঠিক ঘাড়ের উপর। ফিরে দাঁড়ালেন উনি। কিছু লোক দ্রুত সরে পড়তে লাগল। কেউ বা হাত চারেক সরে গেল। কি হয়, কি হয় ভাব। উনি অপেক্ষা করলেন না। হুকুম দিলেন 'চার্জ। অশান্ত জনতা।'

মানুষজন ইঁদুরের মত এধার ওধার ছুটতে লাগল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল কেউ। আর্তনাদ, মৃত্যু-চিৎকার। কেউ গাড়িতে গিয়ে উঠল, লাইন ধরে ধরে ছুটল, আনাচে কানাচে ঠেলাঠেলি। এমনকি ঝাড়ুদার পোর্টাররাও সবকিছু ফেলে মালবাবু কিংবা স্টেশনমাস্টারের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগল। একটা আবদ্ধস্থানে চলল পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য। ধুপধাপ! আঃ। বাবাগো! ভয় নেই! এ পথে!...পালান!···গুলি···না···টিয়ার গ্যাস! না!···তবে?··· বেরোন আগে।···

এরই মধ্যে একসময় একজন অফিসার চিৎকার করে উঠল, 'থার্ডম্যান ?' তৃতীয় আসামী কই ?' খোঁজ, খোঁজ খোঁজ। কোথায় ? কোথায় ? তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের ঝালাইশ্রমিকটি উধাও। সমস্ত প্ল্যাটফর্ম তোলপাড়। থার্ডম্যান! ছাত্র এবং কৃষকটির বুকে তখন সঙিন ঠেকানো। না, কোথাও পাওয়া গেল না। এক পোর্টারের সঙ্গে লোকোশেডের চোরাগলিতে, ট্রেনের তলা দিয়ে পেরিয়ে গেছে অনেক দূর।

মিনিট দশেক পর। স্টেশন নীরব, প্ল্যাটফর্ম শান্ত। ঘড়ি চলছে। হাওয়া মাতছে। দুলছে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া।

দুই বন্দীকে তোলা হচ্ছে ট্রেনে। এখানে ওখানে চাপ চাপ ছড়ান রক্ত। গাঢ় টকটকে। যেন সিঁদুরগোলা রঙ। দু'এক টুকরো মাংস চর্বি। এক অফিসার জুতোর তলায় রক্ত মাড়াতে মাড়াতে আপশোসের সঙ্গে বলল, 'এই কৌশলে ওরা থার্ডম্যানকে নিয়ে গেল...আমি কিছুটা আঁচ পেয়েছিলাম।'

সেই পুরনো ঘড়িটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। সময় নির্দেশক। বড় এবং ছোট কাঁটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়াতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। ওরা

দু'জন মুখ বাড়াল। একজন অফিসার কি বলতেই ছাত্রটি বলল, 'একটু নিশ্বাস নিতে দিন...প্লিজ।' উত্তরে ওদের চোখের সামনেই ঘটাং করে জানলা বন্ধ করে দেওয়া হল। নিষ্ফল আক্রোশে দুম্ দুম্ করে বন্ধ জানালায় এ দুই বন্দী ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল। একটু মুক্ত বাতাস।

'বিদায় !'

স্টেশন, রক্তাক্ত প্ল্যাটফর্ম, পড়ে থাকা আহত মানুষজন, এমন কি এই মহাপৃথিবীকেই ওরা যেন শেষ বারের মত জানাচ্ছে, 'বিদায়।'

গাড়ি চলে গেল।···

অমূল্য আর সোনা তখন শহরের পথে পথে ঘুরে বিফল হয়ে গেছে। বসন্তোৎসব জমেনি। শহরবাসীর মনে আনন্দ নেই। রঙ খেলবে না তারা। পথে পথে মিলিটারি ট্রাকের পাহারা। এলাকায় এলাকায় কর্ডনিং।

অমূল্য বলে, 'চ সোনা !...বড্ড ভয় লাগে !···কেমন উঁচিয়ে আছে দেখছিস?'

সোনা আস্তে জবাব দেয়, 'চ। দিন ভাল না। রঙ টঙ খেলবে না কেউ।'

ওরা আবার হাঁটতে থাকে। শূন্য আকাশে শকুন। রাবিশের স্তূপে ছোট ছোট ঘূর্ণি। বাতাস ঝাপটায়। পায়ের নিচে গলা পিচ।

ওরা ক্লান্ত পায়ে প্ল্যাটফর্মের পরিচিত থামের কাছে আসতেই সোনার চোখে পড়ে চাপ চাপ টকটকে লাল রঙ।

অবাক হয়ে বলল, 'ও অমূল্য !...দেখছিস ? এখানে এমন দোল খেলল কারা।'

অমূল্য ঝুঁকে রক্তাক্ত চর্বির টুকরোটা দেখে আঁতকে উঠল। চারদিক অস্বাভাবিক খাঁ খাঁ। থমথমে। সামনে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'দোল খেলাই বটে !···দামী রঙ ! ··আজ রাতে আর এখানে থাকতে দেবেনা।'

সামনে কৃষ্ণচূড়া দুলছে, নীলচে আকাশ, বাতাসের মৃদু শনশনানি। মনে হল শহরের বসন্তে এবার কিসের এক নতুন মাতলামি ॥